স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন সাফল্য ঃ ঘটনা সমীক্ষা

নীলুফার বেগম
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

1994-1995

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন সাফল্য ঃ ঘটনা সমীক্ষা

নীলুফার বেগম
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান

1994 — 1995

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

ঘটনা সমীক্ষা - ১

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন সাফল্যঃ
ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে গৃহীত স্থানীয় উদ্যোগ
থানা ঃ ভান্ডারিয়া, জেলা ঃ পিরোজপুর

ভূমিকা

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত আকাঙ্খিত একটি বিষয় । কারণ এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে সার্বিক অংশগ্রহণ ও অনুভূত চাহিদা অনুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হয় ।

বাংলাদেশের জন্য এটি আরও বেশী প্রয়োজনীয় বিষয় এই কারণে যে, এদেশে স্থানিক ও আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে চাপিয়ে দেয়া কোন নীতি ও পরিকল্পনা সফল করা সম্ভব হয় না । প্রায়শ তা ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয় ।

বাংলাদেশে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের কিছু উদাহরণ অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এগুলো তেমন ভূমিকা আজও রাখতে পারেনি, সেকারণে বিষয়টি আজও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে ।

১৯৯২ সালে পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক 'স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন'এর একটি প্রয়াস আরম্ভ হয় । বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষ ১৯৯৪ সালে এই প্রয়াসের তথ্যাদি জানতে পেরে দু'জন অনুষদ সদস্যকে সেখানে পর্যবেক্ষণ ও তার ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রেরণ করে । ১৯৯৫ সালের ২৯-৩০ শে জানুয়ারী সেই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে দু'দিন ব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন । কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে 'ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নর স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন' কর্মসূচির স্থায়িত্ব এবং অন্যত্র প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে ফলোআপ কর্মসূচি তথা একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষনার সিদ্ধান্ত বিপিএটিসি গ্রহণ করে ।

এর কাছাকাছি সময়ে রাজশাহী বিভাগের লালমনিরহাট জেলায় সরকারী কর্মকর্তা তথা জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে 'লালমনিরহট সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন' নামে আরেকটি স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্য পাওয়া যায় । তখন বিপিএটিসি চিন্তা করে যে, যদি জন প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তার উদ্যোগে গৃহীত স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচি দু'টির সার্বিক তথ্য 'ঘটনা সমীক্ষা' আকারে পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেশের আপামর জনগণের জন্য একটি দৃষ্টান্ত মূলক স্থানীয় উদ্যোগের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে । সেই ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে দু'টি ঘটনা সমীক্ষার সমাহারে বর্তমানে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে ।

এই প্রতিবেদন প্রণয়নে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের জন প্রতিনিধিবৃন্দ ও জনগণ এবং লালমনিরহাট জেলার সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ও জনগণের নিকট থেকে যে প্রভৃত পরিমাণ সহায়তা আমরা লাভ করেছি, তার জন্য তাঁদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ । বিপিএটিসি'র গবেষণা কমিটি প্রকল্পটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করে আমাদের সমীক্ষার পথ সুগম করেছেন, তাই কমিটিকেও ধন্যবাদ

জানাচ্ছি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণে আ,ক,ম, মাহবুবুজ্জামান এবং লালমনিরহাটের কার্যক্রম পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন লিপ্ত ছিলেন । তিনজন সমীক্ষক একত্রে পর্যালোচনা করে দুটি ঘটনা সমীক্ষা একত্রিত আকারে পাশাপাশি সংস্থাপন করে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছি ।

কেন্দ্রের এমডিএস জনাব এ কে এম শামসুল আলমএবং অনুষদ সেমিনারে মতামত প্রদানকারী অনুষদ সদস্যবৃন্দকে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি । সাঁটমুদ্রাক্ষরিক জনাব শিবেন্দ্র শুক্লা দাসকে তার আন্তরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিবেদন মুদ্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাই ।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা, ঘটনা সমীক্ষার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও পরিধি

১.১ ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশে "স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন" প্রচেষ্টা খন্ড খন্ড ভাবে ষাটের দশক থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সরকারী সহায়তায় স্থান বিশেষের উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কর্তৃপক্ষের পরীক্ষামূলক উদ্যোগ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়েছে। এগুলো পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, দীর্ঘদিন টিকে থাকা ও ক্রম-উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রায়শ অব্যাহত থাকেনি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা স্থানিক পর্যায়কে অতিক্রম করতে এবং অন্যত্র প্রয়োগযোগ্য হতে সক্ষম হয়নি। ফলে 'স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন' প্রায়ই স্থানীয় থেকে গেছে অথবা কালক্রমে সে উদ্যোগ বিলীন হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ অত্যন্ত প্রাচীন একটি সংগঠন। এর কার্যক্রমের পরিধি ও ধারা নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা সরকারী পর্যায়ে করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী তো হয়ইনি, উপরন্তু ক্রমাগতভাবে সেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ দ্বারা কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। এমনকি কতিপয় ইউনিয়ন পরিষদ তার দাপ্তরিক ব্যয়ভার বহনেও সমর্থ নয়।

এরূপ হতাশাব্যঞ্জক চিত্র দূরীভূত হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাম্য হলেও রূপরেখা নির্ধারণে আজও সফলতা আসেনি। ফলে স্থানীয় সরকার আর্থিক ও উন্নয়ন জনিত কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী রয়ে গেছে।

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন প্রচেষ্টার দু'টি ইতিবাচক দিক বিদ্যমান। একটি হলো সঠিক উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, যা কেন্দ্রীয়ভাবে কখনই সম্ভব নয়। অপরটি হলো জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ। স্থানীয় পর্যায় থেকে উদ্যোগ গৃহীত হলে সার্বিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাবে গৃহীত প্রকল্পে এরূপ অংশগ্রহণ কৃত্রিম অথবা আংশিক হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নে যে সমস্ত ক্ষেত্রে সফলতার ইতিহাস ইতঃপূর্বে পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো সঠিক কাঠামো ও বিধি বিধানের অভাবে স্থায়িত্ব লাভ করেনি। এক্ষেত্রে কারণটি নির্ণয়ও খুব সহজ। একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কাজের উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নিয়ে জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণে যখন একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন বা একটি ধারার প্রবর্তন করেন, তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিটির অধ্যবসায়, চিন্তা-চেতনা, শ্রম ও নেতৃত্ব সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ৪ বছর পর তাঁর মেয়াদ শেষ হলে নতুন নির্বাচিত জন-প্রতিনিধির মধ্যে সে সমস্ত গুণাবলীর বিদ্যমানতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রীয় বিধান অনুসারেও তিনি উন্নয়ন ধারাটি অব্যাহত রাখার জন্য বাধ্য থাকেন না। ফলে নেতৃত্বের পরিবর্তনে উন্নয়ন উদ্যোগ পরিবর্তিত এবং অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে আর্থিক বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা ও বাধ্যবাধকতা গড়ে উঠেনি। ফলে জন প্রতিনিধিবৃন্দ তহবিল তছরূপ না করে থাকলে কোন প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা না করলেও প্রচলিত বিধি বিধানে কোন প্রকারে দায়ী থাকেন না। কেন্দ্রীয় সরকারকেই স্থানীয়

উন্নয়নের পরিকল্পনা ও ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে। তাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাটি কেবল স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের পদ ও সম্মান প্রদানের জন্য একজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আজও কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এরূপ হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার মধ্যে গত ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে বরিশাল বিভাগস্থ পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার ভিটাবাড়িয়া নামক একটি ইউনিয়নে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের সংবাদ ও তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ-লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রয়োদশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল গ্রাম-সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনে সেই ইউনিয়নে গমন করেছিল। তাদের প্রদত্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে কেন্দ্র থেকে দু'জন অনুষদ সদস্যকে ৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ প্রেরণ করে। পর্যবেক্ষকদ্বয়ের (জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-পরিচালক ও জনাব আ,, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান, উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বিপিএটিসি) একটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। সেই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৫ সালের ২৯-৩০শে জানুয়ারী কেন্দ্রে এ বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ভান্ডারিয়া থানার কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অপরপক্ষে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে তৎকালীন সচিব (স্থানীয় সরকার বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার পরিচালক, এন আই এল জির, মহা-পরিচালক, যুগ্ম সচিব (স্থানীয় সরকার বিভাগ), সহ বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার একটি সুপারিশ ছিল এই যে, ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন কার্যক্রম স্থায়িত্ব লাভ করবে কি না এবং তাদের প্রণীত গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ ও কার্যক্রমের ধরন বাংলাদেশের অন্যান্য ইউনিয়নসমূহে প্রয়োগযোগ্য হবে কিনা এ বিষয়ে একটি

পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পরবর্তীকালে বিপিএটিসি গ্রহণ করলে বিষয়টি নীতি নির্ধারকদের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে । সেই সুপারিশ অনুসারে বিপিএটিসি একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে এবং ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষকদের মধ্যেকার একজনকে (জনাব আ ক ম মাহবুবুজ্জামান) পুনরায় সেই ইউনিয়নে প্রেরণ করা হয় । বর্তমান ঘটনা সমীক্ষা প্রতিবেদনটি জনাব মাহবুবুজ্জমানের সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে প্রণীত হলো ।

১.২ ঘটনা সমীক্ষার যৌক্তিকতা

১) ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার পদ্ধতির ব্যাপক সংস্কারের লক্ষ্যে একজন সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে । ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের কার্যক্রম এবং স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন কাঠামো ও ধারার বর্ণনা সেই কমিটির নীতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।

২) ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ ও ইউনিয়নের জনগণ তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন পেলে তাদের ভাল ও মন্দ দিক অনুধাবন করতে সক্ষম হবে । ফলে উদ্যোগটি স্থায়িত্ব লাভের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করতে পারবে ।

৩) বাংলাদেশের অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ এরূপ একটি দৃষ্টান্তমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিজেদের এলাকায় উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হতে পারে ।

১.৩ ঘটনা সমীক্ষার উদ্দেশ্য

১) স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম বিশ্লেষণ;

২) স্থানীয় পর্যায়ে পরিচালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার ৪ বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ণয়;

৩) এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার স্থায়িত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা ;

৪) অন্যান্য ইউনিয়নে এরূপ কাজের প্রয়োগযোগ্যতা বিশ্লেষণ;

১.৪ পরিধি

বর্তমান ঘটনা সমীক্ষাটির পরিধি স্থানিক ভাবে ভিবাড়িয়া ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ । বিষয়বস্তুর দিক থেকে গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ গঠন, গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের পালিত কার্যক্রম, ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, প্রকল্প গ্রহণ, ইউনিয়নের জনগণের উন্নয়ন, ৪ বছরে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, গৃহীত উদ্যোগের স্থায়িত্ব প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘটনা সমীক্ষা পদ্ধতি

ক) সমীক্ষা এলাকা ঃ পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন সমীক্ষা এলাকা হিসেবে পর্যবেক্ষিত হয়েছে ।

খ) উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ বর্তমান ঘটনা সমীক্ষা পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ, অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার এবং ইউনিয়ন পরিষদের নথিপত্র পর্যালোচনা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে ।

একই সমীক্ষক (আ, ক,ম, মাহবুবুজ্জামান) কর্তৃক দুই বছর পূর্বের (১৯৯৪ সাল) গৃহীত কার্যক্রম এবং দুই বছর পরে (১৯৯৬ সাল) কার্যক্রমের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষিত হয়েছে ।

ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার লোকের সঙ্গে অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারে উন্নয়নের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে ।

ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরীণ আয়ের পরিমাণ, উৎস, বিভিন্ন খাতে বিগত ৪ বছরের খতিয়ান গ্রহণসহ গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের কার্যক্রম ও অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্য (মাধ্যমিক) সংগ্রহ করা হয়েছে , যা মাধ্যমিক উপাত্ত বলে বিবেচিত হতে পারে ।

গ) উপাত্ত বিশ্লেষণ ঃ সমীক্ষক কর্তৃক যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষিত এবং সাক্ষাকারে প্রাপ্ত বিষয় ও নথিপত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষিত হয়েছে । পরে গবেষকবৃন্দ একত্রে তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে ।

ঘ) প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ সমীক্ষা এলাকার ৪ বছর পূর্বের গৃহীত কার্যক্রম (১৯৯২ সাল) এবং ১৯৯৬ সালে কার্যক্রমসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধি তুলনা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের স্বরূপ

৩.১ স্থানিক বর্ণনা

পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নটির উত্তর পূর্ব দিকে 'পুনা' এবং তার শাখা 'কচা' নদী দ্বারা বেষ্টিত একটি ইউনিয়ন । এর লোক সংখ্যা (১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) ২১,১১৭ জন। ইউনিয়নটিতে মোট ৪টি গ্রাম রয়েছে । সেগুলোর নাম ঃ শিয়ালকাঠি, মোদিরাবাদ, তারাবুনিয়া, উত্তর ভিটাবাড়িয়া ও দক্ষিণ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে মৌজার সংখ্যা ৪টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩টি, মাদ্রাসা ১৩টি, গভীর ও অগভীর নলকূপ ২৩৫টি, সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র ১টি, পাকা সড়ক ১টি (৫ কিঃমিঃ), ইট বিছানো সড়ক ৫ কিঃমিঃ, কাঁচা সড়ক ৫ টি (৩০কিঃমিঃ)। ইউনিয়নটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিদ্যমান আছে ।

অধিকাংশ জনগণের প্রধান পেশা কৃষিকাজ এবং সুন্দরবনে কাঠ ও গোলপাতা সংগ্রহে বাওয়ালীর কাজ । নৌকা চালনা, গোলপাতা ও হোগলাপাতার ব্যবসা, পান পাতা, কলা ও সুপারির ব্যবসা অন্যতম পেশা হিসেবে পরিগণিত । এলাকার প্রধান ফসল ধান, কলা, পেঁপে, পান, সুপারি, নারিকেল, পেয়ারা ও রবিফসল ।

ছোট ছোট খালে ভরপুর এই ইউনিয়নের লোক জোয়ার ভাটায় ব্যবসা বাণিজ্য প্রধানত নৌকা যোগে করে থাকে । এলাকায় ৭০ ভাগ মুসলমান ও ৩০ ভাগ হিন্দু বাস করে ।

৩.২ জনগণের বৈশিষ্ট্য

সুন্দরবনে বাওয়ালীর কাজ করার কারণে এলাকার বেশীর ভাগ লোক বেশ সাহসী । এদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অতিথি পরায়ণতা বিদ্যমান । হিন্দু -মুসলিম সম্প্রীতি প্রশংসনীয় । মেয়েরা পর্দানশীন । বড়রা বোরখা পরে বা চাদরের অবগুণ্ঠনে এবং হাতে একটি ছাতা নিয়ে চলাফেরা করেন, যাতে প্রয়োজনে ছাতা দ্বারা নিজেদেরকে আরও বেশী আড়াল করে রাখা যায় । স্কুল গামী কিশোরীদের হাতেও একই কারণে ছাতা দৃশ্যমান হয় । পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রবণতা বিদ্যমান । অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পরিবার প্রতি গড় সন্তান সংখ্যার হার কিছুটা বেশী, গড়ে ৫জন । জনগণের মধ্যে গরীবের সংখ্যা ধনীদের তুলনায় যথেষ্ট বেশী, দিনমজুর ও ক্ষেত মজুরের সংখ্যাও তাই অধিক ।

৩.৩ স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম

ক) এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খান মোঃ এনায়েত করিম । পর পর দু'বার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন । ১৯৮৮ ও ১৯৯২ সালে । ১৯৮৮ সালে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি ইউনিয়নটিতে কিছু জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালান । তখন ইউনিয়নে চুরির ঘটনা খুব বেশী ছিল। তিনি এটি বন্ধ করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা প্রহরার মাধ্যমে রাত্রিকালীন গ্রাম-প্রহরার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নলকূপের পানি পান ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। কিন্তু ইউনিয়নের নির্বাচিত ৯জন মেম্বারের তত্বাবধানে এসব ব্যবস্থা খুব বেশী ফলপ্রসূ করতে সক্ষম হননি ।

খ) ১৯৯২ সালে নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডকে ১০টি করে কাল্পনিক গ্রামে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি গ্রামে একটি করে 'গ্রাম উন্নয়ন কমিটি' (সংক্ষেপে গ্রাউক) গঠন করেন। কাল্পনিক গ্রামগুলি সংযুক্ত বসতির ভিত্তিতে করা হয় এবং একেকটি গ্রামে অনধিক ১০০ টি পরিবার অর্ন্তভুক্ত হয়। গ্রাউকের সদস্য সংখ্যা ৭জন এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ১জন মেম্বারকে সমন্বয়ক ও উপদেষ্টা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নির্ধারণ করেন। গ্রাউক গঠনে প্রতিটি কাল্পনিক গ্রামে (অনূর্ধ্ব ১০০ পরিবার) সভা করা হয় এবং প্রস্তাব ও সমর্থন এবং হাত তোলার মত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য ৭জন নির্বাচিত করা হয়।

গ) গ্রাউকের গঠন কাঠামো

প্রধান উপদেষ্টা	ঃ	ইউপি চেয়ারম্যান
সমন্বয়ক/উপদেষ্টা	ঃ	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ১ জন ইউপি মেম্বার
সভাপতি	ঃ	গ্রামের নির্বাচিত ১জন
সম্পাদক	ঃ	গ্রামের নির্বাচিত ১জন
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	গ্রামের নির্বাচিত ১ জন
সদস্য	ঃ	গ্রামের নির্বাচিত ৪ জন

৭ জন নির্বাচিত ও পদাধিকার বলে ২ জন (মোট ৯জন)

এভাবে ৩টি ওয়ার্ডে মোট ৩০টি গ্রাউক গঠন করে তিনি গ্রাউকগুলোর মাধ্যমে প্রতিটি এলাকার উন্নয়নের একটি কাঠামো সৃষ্টি করেন।

গ) ১৯৯৪ সালে গ্রাউকের কাযক্রম মূল্যায়ন করে গ্রাউক গঠনে কিছুটা পতির্বতন করেন। তখন প্রতি ওয়ার্ডে ১০টির পরিবর্তে ৯টি এবং সর্বমোট ২৭টি কাল্পনিক গ্রাম ও গ্রাউক গঠন করেন। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির পরির্বতে এর নাম দেয়া হয় 'গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ বা 'গ্রাউপ'। এতে সুবিধা হয় এই যে, প্রতি ওয়ার্ডের ৩জন নির্বাচিত ইউপি মেম্বারের প্রত্যেকে ৩টি করে গ্রাউকের সমন্বয়ক/উপদেষ্টা মনোনীত হন, যা পূর্বের কাঠামোতে বিভাজনে অসুবিধা হচ্ছিল। গ্রাউকের সদস্য সংখ্যা ৭ থেকে ৯ জনে উন্নীত করা হয় এবং গ্রামের বর্ষীয়াণ ও শ্রদ্ধেয় ১জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পদে এবং একজন মহিলাকে নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য পদে সংযুক্ত করা হয়। নতুন কাঠামোতে সদস্য নির্বাচনে বিভিন্ন পেশার জন্য কোটা পদ্ধতি সংরক্ষণ করা হয়।

৩.৪ গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের কার্যক্রম ঃ

গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত কার্যএম পরিচালনা করছে ঃ

ক) রাত্রিকালীন প্রহরার মাধ্যমে গ্রামের চুরি-ডাকাতি রোধ ও নিরাপত্তা বিধান;

খ) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি ও উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ;

গ) সরকারী ও খাস জমিসহ সকল রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা এবং বেকার দরিদ্রদের আয়ের সংস্থান;

ঘ) ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সহায়তা,

ঙ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরকরণ;

চ) নলকূপের পানি পান নিশ্চিতকরণ;

ছ) স্ল্যাবযুক্ত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

জ) মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন পেশা/ট্রেড ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) প্রকাশ্যে ধূমপান ও ধূমপান সামগ্রী বিক্রি বন্ধকরণ;

ঞ) সালিসের মাধ্যমে মামলা প্রবণতা হ্রাসকরণ ও সামাজিক শৃংখলা বৃদ্ধিকরণ;

ট) সাময়িকভাবে ছাগল পোষা নিবারণ এবং গরু/মহিষ বাড়ীতে বেঁধে রেখে পালন নিশ্চিতকরণ;

ঠ) পোনামাছ ধরা বন্ধকরণ ও সমবায়ভিত্তিক মৎস্য চাষ বৃদ্ধিকরণ;

ড) রবি শস্যের আবাদ বৃদ্ধির জন্য সাময়িকভাবে বাঁধ নির্মাণে সমবেত প্রচেষ্টা গ্রহণ;

ঢ) বিলের/ক্ষেতের জোঁক নিধন এবং বলদ/মহিষের অসুখ ও অকালমৃত্যু রোধকরণ;

ণ) সকল নাগরিককে স্ব স্ব ধর্মীয় উপাসনা ও কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ।

৩.৫ গৃহীত কার্যক্রমের বর্ণনা

ক) উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ঃ

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে যে কোন বহিরাগত প্রথমেই যেটি টের পাবেন, তা হলো; ইউনিয়নের জনগণ তাদের সমস্যাবলী সমাধানে এবং নতুন কিছু করার জন্য বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে । সবার মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার মানসিকতা গড়ে উঠেছে । শিশু শিক্ষা , স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যাকরণ, সমবায় ভিত্তিক মৎস্য-চাষ প্রভৃতি বিষয়সমূহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে ত্যপরতা বেড়েছে । জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়াও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের সাফল্য নির্দেশ করে । মাঝে মাঝে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি কার্যক্রম সাধারণ জনগণকে তাদের সমস্যা চিহ্নিতকরণে এবং স্বীয় উদ্যোগে সমাধান আনয়নে আরও তৎপর করে তুলেছে। এসমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে ছাপানো লিফলেটও অনেক সময় বিতরণ করা হয়েছে, যা জনমনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়েছে ।

খ) রাত্রিকালীন গ্রাম প্রহরা ঃ

গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের অধীনস্থ পলাকার প্রতিটি পরিবারের সক্ষম পুরুষদের একটি তালিকা গঠন করা হয়েছে । তাদের মধ্য থেকে নিয়ে গঠিত ৭ সদস্যের একটি পাহারা দল সারা রাত ধরে তাদের জন্য নির্ধারিত এলাকা (কাল্পনিকগ্রামে) পাহারা দেয় । ফলে একটি পরিবারের ১জন সদস্য প্রতি মাসে ২বার (২রাত) গ্রাম পাহারায় নিযুক্ত থাকে । এদের গ্রাম পাহারা নিশ্চিতকরণের জন্য গ্রাউপ সদস্যবৃন্দ পালাক্রমে তদারক ও পরিদর্শন করেন । রাত ১১টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত বহিরাগত কেউ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে প্রবেশ করতে পারে না । এমনকি ঐ গ্রাম বা ইউনিয়নের লোকও রাতে পূর্ব অনুমতি ব্যতীত চলাচল করতে পারে না । এর ফলে বিগত ২ বছরে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে কোন চুরি-ডাকাতি বা রাহাজানি ঘটেনি । গাছের ফল, ক্ষেতের ফসল প্রভৃতি অটুট দেখে বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে, এটি বাংলাদেশের একটি ইউনিয়ন । এলাকায় পাহারা প্রবর্তনের ফলে সুপারি, পান, নারিকেল, এবং কলার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে । কাঁচা সুপারি কেউ এখন ছিঁচকে চোরের ভয়ে বিক্রি করে না । ফলে এসব পণ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ।

গ) রাস্তার পাশের বৃক্ষ রোপণ ঃ

ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ এই ইউনিয়নের সফলতম উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম । ইউনিয়নভুক্ত সকল সরকারী রাস্তার দুপাশে এবং খাস জমিতে কলা গাছ লাগানো হয়েছে ৪৫,০০০ টি । কলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে ২০,০০০ টি কাঠাল এবং ৫,০০০টি মেহগনি , নিম প্রভৃতি বৃক্ষের চারা লাগানো হয়েছে বলে জানা গেছে । রাস্তার ফলবান কলাগাছ , পেঁপে এবং কাঁঠালের সারি যে কোন আগন্তুকের চোখ জুড়ানোর জন্য যথেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে । প্রতিটি

কলাগাছ লাগানোর জন্য কলা চাষীর উপর ৩টাকা করে খাজনা ধরা হয়েছে । এর ১টাকা গ্রাউপের কার্যক্রমের জন্য এবং ২ টাকা ইউনিয়ন পরিষদের আয় হিসেবে গৃহীত হয় । দরিদ্র, বেকার, ও রাস্তার পাশের জমির মালিকদের কলাগাছ লাগানোর অনুমতি দেয়া হয় । প্রতিটি কলাগাছ থেকে গড়ে মালিকের বার্ষিক ৭০ টাকা করে আয় হয় । ফলে ইউনিয়ন পরিষদের আয় ও তহবিল গঠনের সংগে সংগে যুগপৎভাবে দারিদ্র দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণও সম্ভব হচ্ছে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে । ভবিষ্যতে কাঁঠাল গাছে ফল ধরলে প্রতি বছরের জন্য ১টি গাছ ২০ টাকায় লীজ দিয়ে স্থানীয় সরকারের তহবিল গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে । এতে এলাকায় কাঁঠালের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বেকার জনসাধারণের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে ।

ঘ) ছাগল পালন নিষিদ্ধকরণ ও গৃহে গরু/মহিষ পালন ঃ

এই ইউনিয়নের ছাগল পালন তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধকরণ ও গরু/মহিষ বাড়িতে বেঁধে পালনের বিধান করা হয়েছে । রাস্থায় রোপিত বৃক্ষ, রবিশস্য, শাকশবজি, ফলমূল, ক্ষেতের ফসল প্রভৃতি রক্ষার জন্য ৩ বৎসর মেয়াদী এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

ঙ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

ইউনিয়নে ৬ বছর বয়স্ক শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রায় একশত ভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে । ইউপি চেয়ারম্যানের নিজস্ব উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়নটি 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কার্যক্রমের আওতাভূক্ত করা হয়েছে । ফলে নিয়মিত উপস্থিতি ৯২% নিশ্চিতকরণ সহজতর হয়েছে [1]। ব্র্যাক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমেও এক্ষেত্রে

[1] উৎস ঃ থানা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস, ভান্ডারিয়া ।

পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে । আরেকটি স্থানীয় উদ্যোগ এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে । তাহলো; যে পরিবারের শিশু 'শিক্ষার জন্য খাদ্য ' (গম) পাচ্ছে সে পরিবারের জন্য স্ল্যাবযুক্ত পায়খানার স্ল্যাব ক্রয় (কিস্তিতে) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । সুতরাং সহযোগী কার্যক্রম হিসেবে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ পরিবারে স্ল্যাবযুক্ত পায়খানা নির্মাণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়েছে । অবশ্য সেনিটারী পায়খানা স্থাপনে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে ।

চ) উন্মুক্ত স্থানে ধুমপান নিষিদ্ধকরণ ও বিক্রি বন্ধকরণ ঃ

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে রাস্তা-ঘাটে , মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে, সভা-সমিতিতে প্রকাশ্যে ধুমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে । ইউনিয়নের কোন দোকানে ধুমপান সামগ্রী বিক্রীও নিষিদ্ধ করা হয়েছে । প্রথমে ইউপি চেয়ারম্যানসহ গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সমূহ এ বিষয়ে সভা-সমিতি, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে ধুমপান পরিত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ

করেছে । পরে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, প্রকাশ্যে ধুমপান করা ও বিক্রি করা নিষিদ্ধ হবে । বেশ কিছু ধুমপায়ী ধুমপান পরিত্যাগ করেছেন । বাকীরা গোপনে ধুমপান করেন । প্রকাশ্যে ধুমপান ১৯৯৪ সালে কোথাও দেখা যায়নি ।

ছ) পোনা মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ ও সমবায় ভিত্তিতে মৎস্য চাষ ঃ

বছরের তিন মাস যখন মাছের পোনা ৯ ইঞ্চির ছোট থাকে, তখন পোনা মাছ ধরা এই ইউনিয়নে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । গ্রাউপ এটি তদারক নিশ্চিত করে । তবে এখনও গোপনে কেউ কেউ পোনা মাছ ধরে বলে সংবাদ পাওয়া যায়, প্রকাশ্যে নির্ধারিত ৩ মাসে কেউ পোনা

মাছ ধরেনা । পুরাতন পুকুর, ছোট খাটো ডোবা-নালা প্রভৃতি স্থানে সমবায় ভিত্তিতে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং বেকার যুবক, দরিদ্র ব্যক্তি ও পুকুরের মালিকদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এগুলো পরিচালিত হচ্ছে ।

জ) নলকূপের পানি পান ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারকরণ ঃ

এ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে বলে প্রতিটি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ইউনিয়নের শতকরা প্রায় ১০০% ভাগ লোকই এখন বিশুদ্ধ পানি হিসেবে নলকূপের পানি পান করেন । তবে গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে নলকূপের পানি ব্যবহারের হার শতকরা ১০ ভাগের বেশী নয় [২] । নলকূপের স্বল্পতা এবং নলকূপের পানিতে লৌহ পদার্থের পরিমাণ বেশী বলে জনগণ রান্না, কাপড় ও বাসন ধোয়ার ক্ষেত্রে নলকূপের পানি ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছে না ।

ঝ) সাময়িক বাঁধ নির্মাণ ঃ

এলাকাটি সমুদ্র উপকূল থেকে কাছে বলে জোয়ার ভাটার পানি খালের মাধ্যমে ইউনিয়নের মধ্যে চলাচল করে । শীত মৌসুমে বিভিন্ন খালে সাময়িকভবে বাঁধনির্মাণ করা হলে রবিশস্যের আবাদ করা সম্ভব । কিন্তু বাঁধ নির্মাণ ব্যয়সাধ্য বিষয় বলে কারও একার পক্ষে করা পূর্বে সম্ভব হতো না এবং রবিশস্যের আবাদও তেমন হতোনা । বর্তমানে সমবেত প্রচেষ্টায় গ্রাউপের তত্ত্বাবধানে ৩২ টি খালে এরূপ সাময়িক বাঁধ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে । অপরদিকে গরু, মোষ এবং ছাগলের অত্যাচার না থাকায় ইউনিয়নে রবিশস্যের ফলন বেশী হচ্ছে । বিশেষত খেসারি কলাইয়ের চাষ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । জোয়ারের পানি সরে

---

[2] উৎস ঃ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ।

গেলে প্রায় বিনা চাষে খেসারি কলাই ও অন্যান্য রবিশস্যের বীজ বপন করা হয় । রবিশস্যের অধিক

ফলন একদিকে যেমন কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে অপরদিকে গবাদি পশুর আহার যোগাচ্ছে । এলাকায় বিনাচাষে আলু আবাদের একটি নতুন ধারণা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এই প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে ।

ঞ) জোঁক নিধন ঃ

গ্রাউপের মাধ্যমে বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষকদের জোঁক নিধনে উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে । বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে চাষীরা বিল এবং জলা এলাকায় চাষ করতে যাওয়ার সময় বাশেঁর চোঙ্গায় সোডা ও চুনের পানির মিশ্রণ জোয়ালের এককোণে বেঁধে নিয়ে যান এবং বলদের গায়ে জোঁক লাগলে সেগুলোকে ধরে চোঙ্গার মধ্যে ফেলে দেন । এভাবে সমবেত প্রচেষ্টায় মাঠে জোঁকের প্রকোপ কমে আসে । বদল অসুস্থ হয়ে আর অকাল মৃত্যুতে পতিত হয়না । এটা একটা লাগসই স্থানীয় প্রযুক্তি হিসেবে এলাকার গো-সম্পদ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা রাখছে ।

ট) সালিস ব্যবস্থাপনা ঃ

থানায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে ফৌজদারী মামলার সংখ্যা বিগত চার বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে । এটা সম্ভব হয়েছে গ্রাউপের সালিস প্রথার মাধ্যমে । সালিসে বিবাদ নিস্পন্ন হচ্ছে বলে জনগণ অর্থ খরচ করে থানা-পুলিশ এবং কোর্ট-হাজতে খুবই কম যাচ্ছে । শুধু অর্থের অপচয় হ্রাস পায়নি , শান্তি শৃংখলাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে । বহুকাল পূর্বের গ্রাম্য সালিস প্রথা এখানে আবার বলবৎ হয়ে মানুষকে হয়রানী থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে ।

ঠ) মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

এসএসসি, এইচএসসি বা ডিগ্রী পরীক্ষার পরে ছাত্রদের অবকাশকালীন সময়ে বেকার যুবকদের এবং দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষক ও মজুরদের কৃষি , বৃক্ষরোপণ, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী পালন, পশু-চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে সাময়িক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে ইউনিয়ন পরিষদ একদিকে যেমন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অনেককে প্রশিক্ষিত করেছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় প্রয়োজনে দক্ষ মানুষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু করেছে [3]। স্থানীয় কৃষক জেলে প্রভৃতি সম্প্রদায়কে প্রচলিত ফসল ও মাছের রোগ নির্ণয়ে প্রতিকার ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন এবং বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে উদ্বুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা স্থানীয় পর্যায়ে একটি ফলপ্রসু পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়েছে ।

ড) ধর্মীয় উপাসনায় উদ্বুদ্ধকরণ ঃ

ইউনিয়নে মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থানও উল্লেখযোগ্য । হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মপালনের জন্য একটি বড় আকারের সমাবেশস্থল নির্মাণ করা হয়েছে । তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে । অপরদিকে প্রতিটি মসজিদে একটি করে রেজিষ্টার রেখে স্থানীয় প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের তালিকা রাখা হয়েছে । প্রতি শুক্রবারে আবশ্যিকভাবে এবং প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের নামাজের ওয়াক্তে অনিয়মিতভাবে প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমদের হাজিরা নেয়া হয় । অনুপস্থিতির জন্য কোন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না, কিন্তু এতে সামাজিক লজ্জা এড়াতে উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে । এতে যুবকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটেছে বলে জনগণের বিশ্বাস ।

---

3 কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সুচারুরূপে সংরক্ষিত না হওয়ার ফলে এবিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যা ও তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব হয়নি ।

চতুর্থ অধ্যায়

চার বছর পর (১৯৯৬ সালে) স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন প্রচেষ্টা পর্যালোচনা

৪.১ আলোচ্য ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় প্রধানত ১৯৯২ সালে। ওয়ার্ডগুলোকে কাল্পনিকভাবে ১০টি পরে (৯টি) গ্রামে বিভাজন এবং প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'গ্রাম উন্নয়ন কমিটি বা গ্রাউক' পরে 'গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ বা গ্রাউপ' গঠন বাংলাদেশে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। গ্রাউপের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ তার এলাকাভুক্ত প্রতিটি পাড়া বা পল্লীতে গৃহীত কার্যক্রম সফল করে তুলবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সহজ ও শৃংখলাবদ্ধ হবে, এই নতুন ধারণাটি ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি পাড়ায় বা কাল্পনিক গ্রামে একটি কাঠামোর মাধ্যমে নেতৃত্ব সৃষ্টিও একটি নতুনতর বিষয়। গ্রাউপগুলো ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃত্বের অধীনে যেমন সুচারুরূপে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে, তেমনি তৃণমূল পর্যায় থেকে নেতৃত্ব গড়ে উঠার ফলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শূন্যতা থেকে এলাকাটিকে মুক্ত রাখছে।

৪.২ গ্রাউপ গঠন এবং স্থানীয় উদ্যোগে ইউনিয়নটিকে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা গ্রহণের পর ৪ বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। ৪ বছর পরে ইউনিয়নটির কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও নথিপত্র পর্যালোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করে যে চিত্র পাওয়া গেছে, তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হলো ঃ

৪.৩ গ্রাউপ সমূহের কার্যক্রম ঃ

গ্রাউপ সমূহের কার্যক্রমে সামান্য শৈথিল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে । এর মূল কারণ এই যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব গ্রাউপের কোন স্বীকৃতি নেই । তাই তাদের কর্তৃত্বের পেছনে কেবল ইউনিয়ন পরিষদের সমর্থন ব্যতীত আইনগত কোন ভিত্তি বলবৎ নেই । ধরা যাক, একটি গ্রাউপের সভাপতি বা সম্পাদক একজন তরুণ, শিক্ষিত এবং দরিদ্র ব্যক্তি । তিনি তাঁর গ্রামের (কাল্পনিক গ্রামে) প্রতিটি পরিবারের সদস্যদেরকে রাত্রিকালীন গ্রাম প্রহরার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন । সেই এলাকার একজন ধনী ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্য মাসে ২ রাত গ্রাম প্রহরার দায়িত্ব পালন করলেন না । সেক্ষেত্রে সেই ধনী ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্য কিছু নির্ধারিত টাকা দিয়ে অন্য দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়ে কাজটি কববেন; এরূপ বিধান আছে । কিন্তু তিনি যদি টাকা দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে কাজটি না করান, তাহলে গ্রাউপ সভাপতি বা সম্পাদক তাকে কোন প্রকার জরিমানা করার আইনগত ভিত্তি খুঁজে পান না । ধনীদের এরূপ কার্যক্রম পালনে অনীহা প্রদর্শন গরীবদের মধ্যেও সংক্রমিত হচ্ছে । ফলে রাত্রিকালীন গ্রাম প্রহরায় শৈথিল্য এসে যাওয়া স্বাভাবিক । ঘটছেও অনেকটা তাই ।

কিন্তু যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রাউপের স্বীকৃতি থাকতো, তাহলে সেই গ্রামের কেউ তা অমান্য করলে জরিমানা আদায় সম্ভব হতো এবং অন্যান্য কার্যক্রম পালনও সহজ হয়ে যেতো । বর্তমানে গ্রাউপ কেবল উদ্বুদ্ধকরণ পদ্ধতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়ছে । বাস্তবেও গ্রাম প্রহরা কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে । তবু ইউনিয়নটিতে চুরি-ডাকাতি নেই বললেই চলে । কারণ , বিগত ৪বছর ধরে রাত্রিকালীন গ্রাম প্রহরার কঠোরতায় এলাকার চোর ও ছিচকে চোরগণ বাধ্য হয়ে অন্য পেশা বেছে নিয়েছে অথবা যে পরিমাণ স্বেচ্ছাপ্রহরা বিদ্যমান আছে, তাতেই তারা ভীতির মধ্যে আছে ।

৪.৪ ফলবান বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে স্বাবলম্বী করণ ঃ

১৯৯২ সালে সাময়িক ভাবে রাস্তার পাশে ও খাস জমিতে প্রায় ৪৫ হাজার কলাগাছ, কলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে মেহগনি ও নিম গাছ রোপণ করা হয়েছিল । প্রকল্পটি এভাবে ছিল যে, ৩ বছর পর্যন্ত কলাগাছ বিদ্যমান থাকবে এবং ততদিনে অন্যান্য গাছ বড় হয়ে গেলে কলাগাছ কেটে ফেলা হবে । যতদিন কলাগাছ থাকবে ততদিন কলাগাছের রোপণকারী প্রতিবছর ইউনিয়ন পরিষদকে ৩ টাকা হারে (গাছ প্রতি) খাজনা দিবে । এর ১ টাকা গ্রাউপ তহবিলে এবং ২ টাকা ইউপি তহবিলে জমা হবে । হিসাব মতে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিবছর প্রায় ৯০ হাজার টাকা আয় হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু বাস্তবে এই আয় মাএ ২০ হাজার টাকা ইউনিয়ন পরিষদে জমা হয়েছে । বাকী টাকা গ্রাউপ বা ইউনিয়ন পরিষদ ঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হয়নি । এর কারণ হিসেবে জানা যায় যে, কলা গাছ রোপণকারীদের অধিকাংশই অত্যন্ত গরীব ছিল এবং কলা বিক্রি করে ৩টাকা শোধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা পরে তারা রক্ষা করেনি । উপরন্তু, ১৯৯৫ সালের বন্যায় কলাগাছসহ বেশীর ভাগ অন্যান্য গাছ মরে যায় । তাই ইউনিয়ন পরিষদ গরীব চাষীদের উপর বাকী টাকা শোধ করার জন্য কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করেনি । আরও একটি সংবাদ জানা গেছে যে, কতিপয় ইউপি মেম্বার ও আদায়কারী খাজনার টাকা গ্রহণ করেছে, কিন্তু ইউপি তহবিলে জমা দেয়নি । এই ঘটনার ফলে আরেকটি দিক স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে কঠোরতার আশ্রয় নিতে হতো, যা এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি ।

বর্তমানে কলাগাছ প্রকল্প আর নেই । যেসব রাস্তার পাশে ও খাস জমিতে কাঁঠাল ও অন্যান্য কাঠের গাছ বন্যার পরেও জীবিত আছে, সেগুলোতে ১৯৯৬ সাল থেকে সামান্য পরিমাণে এবং ২০০০ সাল থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আয় নিশ্চিত হবে । ফলে তখন ইউনিয়ন পরিষদ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে ।

ইউনিয়নের বেশ কয়টি রাস্তা 'সড়ক ও জনপথ' বিভাগের মাধ্যমে প্রশস্থ ও পাকা করা হয়েছে । ফলে সে সব এলাকায় পূর্বে রোপিত কাঠাঁল ও অন্যান্য গাছ কাটিতে হয়েছে । বর্তমানে নতুন করে পাকা রাস্তার দুধারে নারিকেল, সুপারি, কাগজীলেবু, কাঠাঁল , মেহগনি, নিম প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়েছে । কিছু রাস্তা পাকা করার জন্য বর্তমানে প্রশস্থ করা হচ্ছে , সেসব এলাকায় রাস্তা পাকা না হওয়া পর্যন্ত কোন গাছ লাগানো হচ্ছে না । নতুন রাস্তার দুধারে তিন সারি করে গাছ লাগানো হয়েছে , যা সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অতুলনীয় হবে । তবে ইউপিকে স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হবে কিনা তা এ মূহুর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না ।

১৯৯২ সালের রোপিত কাঠাঁল গাছের মধ্যে প্রায় ১ হাজার গাছ বন্যা ও রাস্তা প্রশস্থ করার পরেও টিকে আছে । এগুলো থেকে ১৯৯৭ সালে কিছু আয় ইউপি তহবিলে আসতে পারে, যদি গ্রাউপ এবং ইউপি সদস্যগণ সার্বিকভাবে খাজনা আদায় ও তহবিলে জমা দান নিশ্চিত করতে পারে ।

৪.৫ নথিপত্র সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ঃ

এ বিষয়ে এই ইউনিয়ন পরিষদ বেশ পিছিয়ে আছে । এখনও প্রতিটি পরিবারের জনসংখ্যাসহ সকল সম্পদের জরীপ কার্য সমাধা হয়নি । ফলে যে কোন বিষয়ের পরিসংখ্যানে 'প্রায়' অথবা 'আনুমানিক' শব্দটি ব্যবহার করতে হচ্ছে । প্রতিটি পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের যথার্থ হিসাব পাওয়া সম্ভব হয়নি । তবে সকল পরিবারের নিকট সঞ্চয়ী আমানত জমা করার জন্য একটি করে ফরম দেয়া হয়েছে এবং বেশীর ভাগ পরিবার কিছু কিছু করে আমানত সঞ্চয় করছে ।

৪.৬ জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঃ

১৯৯২ সাল থেকে গৃহীত ইউপি কার্যক্রমের মধ্যে নৈশ প্রহরা ও ছাগল-গরু বাইরে ছেড়ে না দেয়ার বিধান বলবৎ করার ফলে ইউনিয়নের সর্বত্র ফলমূল ও পান-সুপারির চাষসহ সকল প্রকার শাক-শব্জির চাষ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। চুরি না হওয়া এবং ছাগল-গরুতে না খাওয়ার ফলস্বরূপ প্রতিটি পরিবার তাদের সীমিত শাক-শব্জি ক্ষেত্র এবং পেঁপে , কলা , পেয়ারা, নারিকেল, সুপারি, প্রভৃতি ফল থেকে যথার্থ ও পর্যাপ্ত আয় করতে সক্ষম হয়েছে । তাছাড়া সমবায় ভিত্তিতে সাময়িক বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে রবিশস্যের চাষের ফলে বাড়তি একটি ফসল বা তার মূল্য পাওয়ায় ইউনিয়নের জনগণের সার্বিকভাবে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে । যা পরিসংখ্যানগত হিসাব ছাড়াও প্রথম দৃষ্টিতে অনুমিত হয় ।

ইউনিয়নের মধ্যে ৫ কিঃ মিঃ রাস্তা প্রশস্থ ও পাকা হওয়ার ফলে পুর্বের তুলনায় রিক্সা চলাচল প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে । অনেকে রিক্সা চালনা পেশা বেছে নিয়েছে । বেকার লোক প্রায় চোখেই পড়ে না । ১৯৯৪ সালে এই ইউনিয়নে দিন মজুর ও কৃষি মজুর প্রাপ্তি সহজ ছিল এবং মজুরী ৪০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । বর্তমানে দিনের মজুরী ৬০/৭০ টাকা দিয়েও সহসা দিনমজুর বা কৃষিমজুর পাওয়া যাচ্ছে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, বেকার প্রায় নেই বললেই চলে এবং সবাই অন্ততঃ দিনে ৭০ টাকার বেশী আয় করছে । একটি ইউনিয়নের আপামর দরিদ্র জনগণের আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে দ্রুত উত্থানে ভিটাবাড়িয়া একটি উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে ।

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের আরেকটি লক্ষণ এই যে, শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । ইউনিয়নটিতে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি চালু থাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি আরও সহজতর হয়েছে । মহিলা শিক্ষার হার বৃদ্ধি পুর্বের তুলনায় আশাব্যঞ্জকভাবে এগিয়ে চলেছে ।

৪.৭ নতুন প্রকল্প গ্রহণ ঃ

ইউনিয়নটিতে প্রায় ১০০ একর জমিতে 'সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ' তথা খামার ব্যবস্থাপনা পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে । নদী থেকে পাম্প মেশিনের সাহায্যে ১০০ একর জমিতে পানি সেচ দিয়ে ইরি ধানের চাষ করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে । এজন্য একটি কমিটি গঠন, জমির মালিকদের স্বীকৃতি গ্রহণ, পাকা ড্রেন নির্মাণ ইত্যাদি সমাপ্ত হয়েছে । ১৯৯৭ সালে প্রকল্পটি চালু হবে । এতে চাষের সমস্ত ব্যয় বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল জমির পরিমাণ অনুযায়ী মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে । প্রথম প্রকল্পটি সার্থক হলে অনুরূপ আরও অনেক প্রকল্প বা যৌথ /সমবায়ী চাষাবাদ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা ইউনিয়ন পরিষদ গ্রহণ করবে ।

এরূপ একটি উদ্যোগ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কর্তৃক আর কোথাও গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । এটির সফলতায় স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নকে উক্ত ইউনিয়নে আরও এক ধাপ সামনের দিকে নিয়ে যাবে ।

৪.৮ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যের আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক ঃ

১৯৯৪ সালে উক্ত ইউনিয়নের ৯জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৩জনের সঙ্গে ইউপি চেয়ারম্যানের বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল । ১৯৯৬ সালে ১ জনের সঙ্গে সখ্য স্থাপিত হলেও বাকী ২ জন এখনও বৈরী আচরণ করছে । বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার এটি একটি বড় সমস্যা, যা এই ইউনিয়নেও বিদ্যমান । তবুও উন্নয়ন কার্যক্রম বিপুলভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে না । এটিই আশ্চর্যের বিষয় । এর পেছনে মূল কারণ এই যে, ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত

পদক্ষেপসমূহ অত্যন্ত জনকল্যাণমূলক এবং তিনি তা দ্রুত জনগণের মাঝে প্রচার করে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছেন । তাই জনগণের সমর্থনের ফলে বৈরী ইউপি মেম্বারদ্বয় বিরোধিতার ক্ষেত্রে খুব একটা সফল হতে পারছে না, বরঞ্চ জনগণ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ছে ।

৪.৯ গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে লক্ষণীয় শিথিলতাঃ

দুটি বিষয় সবার্গ্রে লক্ষণীয় যে, ১৯৯২-৯৪ সালে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে প্রকাশ্যে ধূমপান ও ধূমপান সামগ্রী বিক্রি বন্ধ করা এবং প্রতি শুক্রবার জুম্মা মসজিদে উপস্থিত গণনা করা, এ দু'টি কার্যক্রম বতমানে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক শিথিল করা হয়েছে । ইউনিয়ন পরিষদে ব্যতিক্রমীভাবে তখন এ দুটি সিদ্ধান্ত জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও চরিত্র গঠনে গ্রহণ করলেও পরে পর্যালোচনা করে দেখেছে যে, এই দুটি সিদ্ধান্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন সহায়ক নয় । বরঞ্চ কিছুটা বাড়াবাড়ির নামান্তর বলে গণ্য । তাই উদ্বুদ্ধকরণের পন্থা চালু রাখলেও আইন বা বিধান হিসেবে এ দুটি কার্যক্রম এখন আর চালু নেই ।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ইউনিয়ন পরিষদ তাদের কার্যাবলীর ক্রমাগত মূল্যায়ন করে চলেছে এবং প্রয়োজনে পরিচালিত কার্যক্রম শিথিলতা ও রদবদল করছে যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ।

নলকূপের পানি পানের পাশাপাশি গৃহস্থালীর সকল কাজে এ পানি ব্যবহারের প্রবণতা তেমন একটা বৃদ্ধি পায়নি । পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কিছুটা মন্থর । পূর্বে তা খুবই মন্থর ছিল । কারণ এলাকাটি ধর্মপ্রবণ হওয়ায় বিষয়টি এখনও জনপ্রিয়তা লাভ করেনি ।

৪.১০ জনগণের বিনোদন ব্যবস্থা ঃ

ইউনিয়নের 'সেনের হাট' নামক স্থানে হাই স্কুল প্রাঙ্গনে একটি মিলনায়তন তৈরী করা হয়েছে । বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ এখানে আয়োজনের মাধ্যমে ইউনিয়নের জনগণকে বিনোদনের সুযোগ দান এবং নৈকট্য সৃষ্টির লক্ষ্যে এটি করা হয়েছে । অন্য সময়ে এই মিলনায়তনে বয়স্ক শিক্ষা এবং হাই স্কুলের প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে ।

৪.১১ গ্রাউপসমূহের কর্মকর্তাদের মন্তব্য অনুযায়ী বিরাজিত সমস্যাসমূহ ঃ

গ্রাউপ সদস্যদের মতামত থেকে জানা গেছে যে, প্রথমতঃ গ্রাউপের কোন আইনগত ভিত্তি না থাকায় কেও বিরোধিতা করলে বা নিয়ম ভঙ্গ করলে তারা অসহায় হয়ে পড়ে । দ্বিতীয়তঃ এলাকার উন্নয়নে আইনগত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানে তাদের নিজেদের সঞ্চিত তহবিল খুবই স্বল্প বলে প্রতীয়মান হয় । যেমন - ছোট ছোট খালের উপর সাঁকো বা ব্রীজ নির্মাণ করে শিশুদের যাতায়াত নির্বিঘ্নকরণ সম্ভব হয় না । বন্যায় বিভিন্ন জলাশয় থেকে মাছ বেরিয়ে যাওয়ায় গ্রাউপ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । পুনরায় পোনা ছাড়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, স্যালো টিউবওয়েল সরবরাহ করতে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ইত্যাদি ।

অর্থাৎ গ্রাউপগুলো এখনও প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের মত তহবিল গঠন করতে পারেনি ।

৪.১২ সার্বিকভাবে পর্যালোচনা ঃ

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে নিজেদের কল্যাণ সাধনে গৃহীত কার্যক্রম এবং বিশেষ ও নতুন পদ্ধতির গ্রাউপ সৃষ্টি একটি উদাহরণ ও শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে অন্যান্য ইউনিয়নে বিবেচিত হতে পারে । তবে গ্রাউপগুলোর কোন আইনগত ভিত্তি না থাকায় এবং তাদের আয়ের উৎস সৃষ্টি করে তা থেকে তহবিল গঠনে আরও সময় লাগার ফলে এখনও সেগুলো কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেনি । তবু সমঝোতার মাধ্যমে সমবায়ী মানসিকতায় তারা তাদের সমস্যা সমাধানে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । তারা সালিশ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ইউনিয়নের ফৌজদারী মামলার সংখ্যা কমিয়ে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে । স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে খাল খনন বা বাঁধ নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ও তদারকী, নৈশ প্রহরা প্রভৃতি ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে । যদি এরূপ ব্যবস্থা, নেতৃত্ব ও মানসিকতা বজায় থাকে তাহলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে একটি সার্বিক স্বাবলম্বী ইউনিয়ন হিসেবে ভিটাবাড়িয়া আত্মপ্রকাশ করতে পারে । তবে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্বশর্ত মনে রাখতে হবে, তাহলো; একজন নিস্বার্থ, কল্যাণকামী ও কর্মঠ ইউপি চেয়ারম্যান যদি নেতৃত্ব প্রদান কার্যে ও উদ্বুদ্ধকরণে নিয়োজিত থাকে ।

৪.১২ সার্বিকভাবে পর্যালোচনা ঃ

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে নিজেদের কল্যাণ সাধনে গৃহীত কার্যক্রম এবং বিশেষ ও নতুন পদ্ধতির গ্রাউপ সৃষ্টি একটি উদাহরণ ও শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে অন্যান্য ইউনিয়নে বিবেচিত হতে পারে । তবে গ্রাউপগুলোর কোন আইনগত ভিত্তি না থাকায় এবং তাদের আয়ের উৎস সৃষ্টি করে তা থেকে তহবিল গঠনে আরও সময় লাগার ফলে এখনও সেগুলো কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেনি । তবু সমঝোতার মাধ্যমে সমবায়ী মানসিকতায় তারা তাদের সমস্যা সমাধানে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । তারা সালিশ নিষ্পত্তির মাধামে ইউনিয়নের ফৌজদারী মামলার সংখ্যা কমিয়ে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে । স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে খাল খনন বা বাঁধ নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ও তদারকী, নৈশ প্রহরা প্রভৃতি ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে । যদি এরূপ ব্যবস্থা, নেতৃত্ব ও মানসিকতা বজায় থাকে তাহলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে একটি সার্বিক স্বাবলম্বী ইউনিয়ন হিসেবে ভিটাবাড়িয়া আত্মপ্রকাশ করতে পারে । তবে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্বশর্ত মনে রাখতে হবে, তাহলো; একজন নিস্বার্থ, কল্যাণকামী ও কর্মঠ ইউপি চেয়ারম্যান যদি নেতৃত্ব প্রদান কার্যে ও উদ্বুদ্ধকরণে নিয়োজিত থাকে ।

৪.১৩ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে সৃষ্ট 'স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন' স্থায়িত্ব (**Sustainability**) লাভ করবে কিনা ঃ

এই প্রশ্নটি বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রাচীন । কারণ অনেক উদ্যোগ ও সফলতা এদেশে স্থায়িত্ব লাভ করেনি । তাই সংশয় দূর করা কঠিন । এক্ষেত্রে ভিটাবাড়িয়ায় উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হলে উত্তরটি সহজ হতে পারে ।

১) বৃটিশ আমল থেকে সৃষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান খান মোঃ এনায়েত করিমের পরিবারের উর্ধ্বতন পুরুষগণ বহুবার নির্বাচিত হয়েছেন । এযাবত মাএ ৪বার ইউনিয়নের অন্য লোক চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন । বাকী সকল টার্মে এই পরিবারের সদস্যবৃন্দ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় এই পরিবারটি 'চেয়ারম্যান বাড়ী' নামে এলাকায় খ্যাত । চেয়ারম্যানবাড়ীর স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান জনাব এনায়েত একজন গ্র্যাজুয়েট, মুক্তি যোদ্ধা , রাজনীতিবিদ (১৯৭২ সালে থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন) সমাজসেবী, নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিঃসন্তান । এরূপ একজন স্বচ্ছল ও সমাজসেবী ব্যক্তির নেতৃত্বে ইউনিয়নের জনগণ স্বেচ্ছাশ্রম ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে এগিয়ে এসেছেন

২) জনাব এনায়েত জনগণকে স্বেচ্ছাউদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বহু সভার আয়োজন করেছেন এবং সকল সভা ও স্বেচ্ছাশ্রমের পরে নিজ ব্যয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করেছেন

৩) বৃক্ষরোপণসহ যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে অর্থ সংস্থানে তাঁর ব্যক্তিগত দানের অঙ্ক উল্লেখযোগ্য

৪) প্রতিটি গ্রাউপের কাজ তত্ত্বাবধানে তিনি অবিরত কাজ করে যাচ্ছেন । কোন গ্রাউপে অসন্তোষ বা শৈথিল্য দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ তিনি সেখানে গিয়ে উদ্বুদ্ধকরণে সভার ব্যবস্থা করেন

৫) ইউনিয়নটিতে জাতীয় ভিত্তিক বিভিন্ন দলের শাখা ও কর্মী থাকলেও তা তেমন সক্রিয় নয় এবং চেয়ারম্যানের কাজে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না । অবশ্য এখানেও জনাব এনায়েত উদ্বুদ্ধকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং নিজে সক্রিয়ভাবে রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করছেন

৬) ইউনিয়নটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে খুব একটা বড় নয় এবং সহজেই সকল এলাকা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করা যায়

৭) পারিবারিক প্রতিপত্তির কারণে বৈরী দু'জন ইউপি মেম্বার বা অন্য কোন ব্যক্তি খুব বেশী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না ।

৮) চেয়ারম্যান সাহেবের নিজস্ব পৃথক কোন পেশা নেই এবং সমাজসেবায় ব্যয় করার মত যথেষ্ট সময় বিদ্যমান ।

বিশ্লেষণ -১ ঃ

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন একটির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে তার পরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেই কেবল বলা সম্ভব যে, এরূপ স্থানীয় উদ্যোগ স্থায়িত্ব লাভ করবে কিনা । এ বিষয়ে কেবল এটুকু মন্তব্য করা সম্ভব যে, জনাব এনায়েতের অবর্তমানে অন্য যে কোন চেয়ারম্যানের

মধ্যে এতসব গুনাবলীর সমাবেশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে । ফলে এই উদ্যোগ কিছুটা হলেও স্তিমিত হবে ।

বিশ্লেষণ-২ ঃ

নিছক স্বেচ্ছাশ্রম কোন দেশে কোন কালেই দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করেনা । তাই স্বেচ্ছাশ্রমের পরিবর্তে মজুরী প্রদান পূর্বক নৈশ প্রহরা, বাঁধ নির্মাণ বা বৃক্ষরোপণ ব্যবস্থা করা হলে এবং ব্যয়ভার মেটানোর জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও যথাযথ কর আদায় নিশ্চিত করা গেলে হয়তো স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হতে পারে ।

বিশ্লেষণ-৩ ঃ

গ্রাউপের গঠন ও কার্যক্রমের কোন আইনগত ভিত্তি না থাকলে একসময় নেতৃত্বের কোন্দল সৃষ্টি এবং সালিশী ও অন্যান্য কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি হবে । ফলে স্থানীয় উদ্যোগ ব্যাহত হতে পারে ।

বিশ্লেষণ-৪ ঃ

তবে ইতোমধ্যে অধিক বৃক্ষরোপণ, নৈশ প্রহরা, ছাগল ও গরু বাইরে পালন নিষিদ্ধ করা, বাঁধ দিয়ে রবিশস্য ফলানোর যে আর্থিক ফলাফল জনগণ লাভ করেছেন, অন্ততঃ এক যুগে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেনা । ফলে গৃহীত কার্যক্রমের সুফল ভোগকারী জনগণ সীমিত পর্যায়ে হলেও বহুদিন পর্যন্ত তা টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকবে, এটি তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে ।

৪.১৪ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে গৃহীত পদ্ধতি বাংলাদেশের অন্যসকল ইউনিয়নে প্রয়োগযোগ্য কিনা ঃ

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে গৃহীত উন্নয়ন পদ্ধতি সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সকল ইউনিয়নে সম্ভবতঃ প্রয়োগযোগ্য হবেনা বলে আমাদের ধারণা । কেননা, ভিটাবাড়িয়ার মত নিঃস্বার্থ চেয়ারম্যান ও অন্যান্য পরিস্থিতি বাংলাদেশের সব ইউনিয়নে বিরাজমান নেই । তবে আংশিকভাবে বা ঈষৎ পরিমার্জিতরূপে যে কোন ইউনিয়নে প্রয়োগ করা সম্ভব । আংশিকভাবে প্রয়োগযোগ্য করা হলেও যে কোন ইউনিয়ন স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে । ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে গঠিত গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের ধারণাটি সামান্য পরিমার্জিত অবস্থায় বাংলাদেশের যে কোন ইউনিয়নে নিম্নরূপে প্রযোজ্য হতে পারে ।

১) বর্তমানে ইউনয়ন পরিষদে মোট ৯জন নির্বাচিত মেম্বার থাকেন । এছাড়া ২জন মনোনীত মহিলা সদস্যও রয়েছেন । ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামগুলোকে ১১টি ভাগে (জনসংখ্যা বা গ্রাম/পাড়ার ভিত্তিতে) ভাগ করে যদি একেকটি ভাগে একজন ইউপি সদস্যের অধীনে একটি করে গ্রাউপ ২ বছরের জন্য মনোনীত বা অনানুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত করা হয়, তাহলে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা, কর আদায়, স্বেচ্ছাশ্রমে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ বা পরিকল্পনা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর ও সার্থক হবে । এতে তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্ব সৃষ্টি ও পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব ও কার্যকর করা যাবে ।

২) ভিটাবাড়িয়ার আদর্শ অনুসরণ করে ছাগল ও গরু মাঠে বা অন্যের ক্ষেতে যাওয়া নিবারিত করে নিজের জমিতে বা বাড়ীতে বেঁধে পালন অথবা কিছুকালের জন্য পালন বন্ধ রাখার মাধ্যমে যে কোন ইউনিয়নের বৃক্ষরোপণ ও শস্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব ।

৩)   নৈশ প্রহরার আদর্শ অনুসরণ করে প্রতি গ্রামের গরীব জনগণকে রাতের জন্য মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে । গ্রামের প্রতিটি পরিবার থেকে মাসিক হারে নৈশ প্রহরা চাঁদা বা কর গ্রহণ করে সেই ব্যয়ভার মেটানো যায় । এতে যে কোন গ্রামের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব হবে ।

৪)   বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুসরণ করে প্রতিটি ইউনিয়নের রাস্তার পার্শ্বে সরকারী জমি বা বেসরকারী জমিতে ফলবান বা কাষ্ঠ সমৃদ্ধ বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । সরকারী জমি হলে পার্শ্ববর্তী জমির মালিককে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিবছর বা এককালীন মূল্যের অর্ধেক প্রদান এবং ইউনিয়ন তহবিলে অর্ধেক জমা করা যেতে পারে । এতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদ স্বাবলম্বী হবে । অপরদিকে অর্ধেক মূল্য প্রাপ্তির কারণে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণে উৎসাহী হবে । জমির মালিক জনগণ হলে তারা পূর্ণ মূল্য পাবে এবং সরকারী রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণসহ পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হবে ।

৫)   ভিটাবাড়িয়ার ন্যায় 'সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ' প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে । এতে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তি ও পরিশোধ সহজ হবে এবং অর্থহীণতার কারণে চাষাবাদ বিঘ্নিত হবে না ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ভিটাবাড়িয়ার আদর্শ সামান্য পরিমার্জন করে বাংলাদেশের সকল ইউনিয়নে আংশিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং সরকারের তথা স্থানীয় জনগণের জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে ।

পঞ্চম অধ্যায়

সুপারিশমালা ও উপসংহার

৫.১ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের 'স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন' কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রণীত কতিপয় সুপারিশ সরকার তথা স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন. মন্ত্রণালয় গ্রহণ করতে পারে, যা বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার পদ্ধতিকে বেগবর্ধন ও স্বাবলম্বী করণে সহায়ক হতে পারে । নিম্নে সুপারিশসমূহ পেশ করা হলোঃ

ক) 'গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ' এর অনুরূপ গ্রাম পরিষদ কাঠামো প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং এর আইনগত ভিত্তি প্রদান করা যেতে পারে । গ্রাউপের গৃহীত পরিকল্পনা ও বাজেট অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন ও বার্ষিক বাজেট নির্ধারণ করবে ।

খ) গ্রাউপ ২ বছরের জন্য প্রকাশ্য ও অনানুষ্ঠানিক নির্বাচনের (হাত তোলা বা মৌখিক সমর্থন) মাধ্যমে গঠনের বিধান করণ করা যেতে পারে । আনুষ্ঠানিক নির্বাচন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হবে, যা বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে বহন করা যথার্থ হবে না ।

গ) গ্রাউপের জন্য শালিশী ক্ষমতা প্রদান এবং আইনগত ভিত্তি নির্ধারণ করা যায় । সালিশের বিরুদ্ধে প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদে এবং প্রয়োজনবোধে পরে কোর্টে যাবার বিধান বলবৎ করা যেতে পারে ।

ঘ) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রাউপের জন্য বাধ্যতামূলক করতঃ রাস্তার দু'ধারে ও খাস জমিতে রোপণের জন্য প্রতি গ্রামের ক্ষেত্রে ৫০০ বৃক্ষ সংখ্যা নির্ধারণ । এর রোপণ ও

রক্ষনাবেক্ষকারীকে অর্ধেক মূল্য বা বার্ষিক খাজনা প্রদানের বিধান করা যেতে পারে । এর ফলে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা যাবে ।

ঙ) প্রতি পরিবার থেকে নৈশপ্রহরাসহ উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহে কর আদায়ের ক্ষমতা গ্রাউপকে প্রদান এবং আয়-ব্যয় নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

চ) খাস জমি, পুকুর , জলাশয় প্রভৃতি আবাদ করার জন্য গ্রাউপকে ক্ষমতা প্রদান এবং আয়ের অর্ধাংশ ইউপি তহবিলে জমা দানের মত বিধান তৈরী করা যেতে পারে । এতে স্থানীয় সরকার স্বাবলম্বী হবে ।

ছ) ছাগল গরু বাড়িতে বা নিজ জমিতে পালনের বিধান কঠোরভাবে বলবৎকরণ এবং অমান্যকারীর জন্য উল্লেখযোগ্য শাস্তির বিধান করা হলে বৃক্ষরোপণ ও শস্য রক্ষা সম্ভব হবে এবং দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি সফল করা যেতে পারে ।

জ) সরকারের জাতীয় কর্মসূচিসমূহ, যেমনঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, ইপিআই কর্মসূচি প্রভৃতি বাস্তবায়নের তদারকীর দায়িত্ব গ্রাউপকে প্রদান করা যেতে পারে । তাদের নিকট থেকে ষান্মাষিক রিপোর্ট গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ সম্ভব হবে ।

ঝ) যে ইউনিয়নে যে ফসল বা উৎপাদনদ্রব্য প্রধান, সেটি সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ পদ্ধতি পরিচালনার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাউপের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এতে চাষাবাদ বিঘ্নিত হবে না এবং ঋণ খেলাপের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে ।

৫.২ উপসংহার ঃ

বর্তমান সরকারের আমলে গ্রামকে তৃণমূল পর্যায়ের মূল ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে । তাছাড়া স্থানীয় সরকার পদ্ধতির ব্যাপক সংস্কারের জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে । কমিটি যদি গ্রামকেই উন্নয়নের একক হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, তাহলে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের গ্রাউপ পদ্ধতি কিছুটা পরিমার্জনের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে । এতে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং স্বাবলম্বী ইউনিয়ন পরিষদ গঠন সম্ভব হতে পারে ।

সমাজ সেবার মনোভাব, স্বেচ্ছাশ্রম ও নেতৃত্বের গুণাবলী প্রভৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective) বিষয় সমূহ আইন দ্বারা সৃষ্টি সম্ভব নয় , যা ভিটাবাড়িয়ায় সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু ভিটাবাড়িয়ার গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে যা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) বিষয়, তা ঈষৎ পরিমার্জন করা হলে কেবল প্রয়োগযোগ্যই হবেনা, তা গ্রামীণ জনগণের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকরও বিবেচিত হবে ।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আহমেদ, তোফায়েল ও কাদের আব্দুল (১৯৯৩) ''*স্থানীয় সরকারের যুগ সন্ধিক্ষণ ঃ কাঠামো কার্যগত পুনর্গঠনের আলোকে কিছু সুপারিশ*'' বার্ড, কুমিল্লা।

২। আহমেদ, তোফায়েল (১৯৯৩) ''*সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, পটভূমি, নীতি ও কৌশলঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা*'' বার্ড , কুমিল্লা।

৩। বেগম নীলুফার ও হোসেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) (১৯৯৫) ''*স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন '' (কর্মশালা প্রতিবেদন),* বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৪। মাহবুবুজ্জামান, আ, ক, ম, ও হোসেন, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (১৯৯৪) ''*উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগ ঃ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা ''* (সেমিনার পেপার, ২৯-১-৯৫ তারিখে বিপিএটিসি আয়োজিত কর্মশালায় পেশকৃত)।

৫। ''*ত্রয়োদশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের গ্রাম সমীক্ষা প্রতিবেদন,*'' ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন দল,(১৯৯৪), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৬। আনোয়ার হোসাইন, সৈয়দ (সম্পাদিত) (১৯৯৫) ''*গ্রাম উন্নয়ন পরিক্রমাঃ ১নং ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ ''* কালার স্টেপস, মগবাজার, ঢাকা।

ঘটনা সমীক্ষা-২

স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন সাফল্য ঃ

লালমনিরহাট জেলায় পরিচালিত সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন

প্রথম অধ্যায়

১.০ ভূমিকা ঃ

তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশ সমূহের অন্যতম বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোর দুর্বল অস্তিত্বের কারণে ক্ষেত্রপর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে আমলা নির্ভর নির্বাহী বিভাগই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। প্রশাসন, আইন, উন্নয়ন সকল ক্ষেত্রেই নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত। কিন্তু বৃটিশ উওরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এদেশের আমলাতন্ত্র স্থবিরতায় আক্রান্ত, গতিহীন লাল ফিতার দৌরাত্ম যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে এই স্থবির আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সম্প্রতি স্থানীয় ভিত্তিতে সফল গণশিক্ষা কাঠামোর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে রাজশাহী বিভাগের লালমনিরহাট জেলায়। এই জেলায় ডেপুটি কমিশনারের উদ্যমী নেতৃত্বে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মতো অতি দরূহ অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং আশাব্যঞ্জক দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এই জেলার তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার সমগ্র জেলার জনগণকে নিরক্ষরতার অন্ধকার এবং অভিশাপ থেকে মুক্ত করার তীব্র ও আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেন এবং এই তাগিদ বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম করেন দীর্ঘ দুই বৎসর। এই উদ্যোগ জনসাধারণের মনে অশিক্ষার দুর্বিষহ অভিশাপ ঝেড়ে ফেলার তীব্র বাসনার সৃষ্টি করেছিল- তাই সারা জেলা প্রকম্পিত হয়েছে গণশিক্ষা কেন্দ্র সমূহের তারুণ্যদৃপ্ত কর্মীদের পদভারে। জেলার সকল স্তরের মানুষ সম্মিলিত হয়েছিল এই কর্মকাণ্ডে।

১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লালমনিরহাট জেলায় জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে প্রথমতঃ স্থানীয় উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে সরকারের আর্থিক মঞ্জুরী ও আংশিক কারিগরী সহায়তায় তিনটি পর্যায়ে স্বেচ্ছাশ্রম, প্রথম পর্যায় এবং চূড়ান্ত পর্যায় বাস্তবায়িত হয়েছে সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন।

এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে জেলার স্বাক্ষরতার হার শতকরা ২৪ভাগ থেকে শতকরা ৮৫ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ২ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে। ১১-৪৫ বৎসর বয়সী ২,৭১,১৩০ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয় এই কর্মসূচির মাধ্যমে।

সারণি- ১

বিষয়ঃ এক নজরে সার্বিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচির বিভিন্ন পর্যায়ে অর্জিত অগ্রগতি

স্বেচ্ছাশ্রম পর্যায়ের তথ্যাবলি ও অগ্রগতি

কেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ	৪২১ টি
কেন্দ্র শিক্ষক	ঃ	৪২১ জন
মোট শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ঃ	১৮,০০০ জন
কোর্সের মেয়াদ	ঃ	১ মাস, ২মাস, ৩ মাস ইত্যাদি।
অর্থায়ন সংস্থা	ঃ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন
বাস্তবায়ন সংস্থা	ঃ	প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন
অগ্রগতি	ঃ	১৮,০০০ জন নারী পুরুষ সাক্ষর হয়।

প্রথম পর্যায়ে তথ্যাবলি ও অগ্রগতি

ব্লকের সংখ্যা	ঃ	৪৬টি
কেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ	৯৭৬ টি ক) পুরুষ – ৪৩২ টি খ) মহিলা – ৫৪৪ টি
কেন্দ্র শিক্ষক	ঃ	৯৭৬ জন
ব্লক সংখ্যা	ঃ	৪৬ টি
প্রতিকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ঃ	৩০ জন
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ঃ	৩১,০৯৭ জন
পাঠক্রমের মেয়াদ	ঃ	৬ মাস (১২ই এপ্রিল ১৯৯৪ হতে ১২ই অক্টোবর ১৯৯৪)।
শিক্ষার্থী পিছু ব্যয়	ঃ	প্রায় ১৭৮ টাকা।
অর্থায়ন সংস্থা	ঃ	ক) থানা কমিটি – ৮৪২টি কেন্দ্র খ) পৌরসভা – ৯৮টি কেন্দ্র গ) ইনকেপ – ১১১টি কেন্দ্র ঘ) স্বনির্ভর বাংলাদেশ– ২৫টি কেন্দ্র
অগ্রগতি	ঃ	সমগ্র জেলায় মোট ৪৬টি ব্লকে ৯৭৬টি কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত চূড়ান্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীনীর সংখ্যা ছিল ৩০,২১৭ জন। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ২৯,৪২০ জন প্রায়(৯৪.১৯%,) অকৃতকার্য হয়েছে ৮১৭ জন (২.৮%) এবং ঝড়ে পড়েছে ৮৮০ জন ৩.০১%।

চূড়ান্ত পর্যায়ের তথ্যাবলি ও অগ্রগতি

নিরক্ষরের সংখ্যা	ঃ	২,২৩,৪৩৬ জন
ব্লক সংখ্যা	ঃ	৩৯৮ টি
কেন্দ্র সংখ্যা	ঃ	৭,২৩৭টি পুরুষ কেন্দ্র - ৩,৪৩১টি, মহিলা কেন্দ্র - ৩,৮০৬টি
ব্লক সুপারভাইজার	ঃ	৩৯৮ জন
কেন্দ্র শিক্ষক	ঃ	৭,২৩৭ জন
প্রতিকেন্দ্রে শিক্ষার্থী	ঃ	৩০ জন । (কিছু কেন্দ্রে ৩০-৪০ জন)
পাঠক্রমের মেয়াদ	ঃ	৬ মাস
অর্থায়ন সংস্থা	ঃ	সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)
সর্বমোট নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা	ঃ	প্রায় ৬০,০০০ জন (জেলা হতে কেনদ্র পর্যায় পর্যন্ত)
শিক্ষার্থী পিছু খরচ	ঃ	১৭৪ টাকা
মোট বরাদ্দ	ঃ	বাজেট - ৩,৭৫,৯৪,০২৬.৪২ টাকা
বাস্তবায়ন সংস্থা	ঃ	লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতি
অগ্রগতি	ঃ	১৮ই জানুয়ারী ১৯৯৫ হতে ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত সারা জেলায় একযোগে ৭২৩৭টি কেন্দ্রে পাঠদান কর্মসূচি সম্পন্ন হয় । তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২,২৩,৩৮৪ জন। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২,০১,৬৩২ জন (মোট শিক্ষার্থীর ৮৯.৬৫%) ।

লালমনিরহাট জেলায় গৃহীত এই কর্মসূচিতে বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদেরকে ছয় মাস মেয়াদী পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয় । স্বেচ্ছাশ্রম পর্যায়ে ১৮,০০০ জন, প্রথম পর্যায়ে ২৯,৫২০ জন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ২,০১,৬৩২ জনসহ সর্বমোট ২,৪৯,১৫২ জনকে সফলভাবে স্বাক্ষর করে তোলা হয় । কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সফলতার হার ৯১.৯% । ৮.১% চূড়ান্ত স্বাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হন (সারণী ১;২;৩ দ্রষ্টব্য) । জেলায় এসকল কর্মকান্ড

পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছা শ্রম পর্যায়ে ৪২১টি, প্রথম পর্যায়ে ৯৭৬টি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ৭,২৩১টি গণশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করা হয় । কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পর সারা জেলায় অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই পরিসংখ্যান উপস্থাপিত হয় কর্মসূচির চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে । নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই কর্মসূচিতে নিরক্ষরতার ব্যাখ্যায় লিখতে পড়তে সক্ষম করে তোলা, দৈনন্দিন হিসাব রাখতে সক্ষম করা, স্বাস্থ্য-পরিবার পরিকল্পনা, সেনিটেশন ও পরিবেশ চেতনা সৃষ্টি করা, স্বকর্মসংস্থানের মানসিকতা ও সামর্থ্য সৃষ্টি, সামাজিক কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ এবং স্বেচ্ছাশ্রমে অংশগ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয় ।

লালমনিরহাট জেলায় পরিচালিত এই বিশাল কর্মকান্ডে জেলার সর্বস্তরের জনসাধারণ,, ছোট-বড় মাঝারি কৃষক, শ্রমিক, কামার, তাঁতী, জেলে, মুদি দোকানদার, ডাক্তার, ছাত্র, শিক্ষক সাংবাদিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বর এবং জেলায় কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেন ।

সারণি-২

বিষয় ঃ থানা ওয়ারী গণশিক্ষা কার্যক্রম লালমনিরহাটের চূড়ান্ত পর্যায়ের ফলাফলের অগ্রগতি বিবরণী (১৯৯৬)

শিক্ষার্থী ফলাফল (প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে)							বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্তকেন্দ্র ফলাফল (পাশের হার অনুযায়ী নির্ধারিত					
থানার নাম	গ্রেড-১ (৯০-১০০ নম্বর) এ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	গ্রেড-২ (৮০-৮৯ নম্বর) এ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	গ্রেড-৩ (৬০-৭৯ নম্বর) এ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	স্বাক্ষর সহ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা	অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	গ্রেড-১ (৯০-১০০) নম্বর	গ্রেড-২ (৯০-৯৫) নম্বর	গ্রেড-৩ (৮০-৯০) নম্বর	অকৃতকার্য ৮০% এর নীচে	পাশের হার	মন্তব্য
লালমনির হাট সদর	১০,২১১	১৩,৬৩৪	২৩,৬৯০	৩,৬৯১	৩৫০৩	৬৭	৫৬২	২৯৩	৭৬৮	৯৩	৮৭৯	
আদিতমারী	৭,৫১৩	১০,১০৩	১৫,৫২২	১,৮৩৯	২,৫২৯	৭৩৪	৫৫০	১৮৩	৪৬১	৫৬	৮৮%	
কালিগঞ্জ	১০,৭৩০	৯,৯৮৭	১৩,৬৮৪	১,৭৫৪	২,৯১০১	৩৫২	৬৪৬	১৩৩	৮৬			
হাতীবান্ধা	১১,১৮৫	১২,৮৩৪	১৬,৮৩০	২,৩১৩	২,৫৭৯	২,২৭৯	৫৮১	২৬৮	৬৪৯	৩৬	৮৮%	
পাটগ্রাম	৫,৫২৪	৯,৪০৯	১৬,২৮০	২,৯১৯	২,২৯৭	২,৬৫৫	৩১৮	১২৭	৫৩৮	২২৮	৮৬%	
লালমনির হাট পৌরসভা	৯২৯	১,২৭৯	১,৯৯২	৪২৬	৪১১	৬৬	২৭	২৩	৯৯	২২	৮৩%	
মোটঃ	৪৬,০৯২	৫৭,২৩৬	৮৪,৯৬৩	১৩,৩৪১	১৩,৭২৯	৫৯৫৩	২৬৮৪	১০২৬	৬৪১	৫২৩	৮৬%	

বিঃ দ্রঃ এছাড়াও বিভিন্ন থানায় মোট ৪১টি কেন্দ্র থানা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থী সংখ্যা ১,৩২১ জন। কালিগঞ্জ থানায় এনজিও কর্তৃক ২৫টি কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। (শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭৫০জন)।

জেলা পর্যায়ে স্থানীয় ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে পরিচালিত এই অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত ইতোমধ্যে দেশের অন্যান্য জেলাসমূহে প্রভাব ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বরিশাল বিভাগে ভোলা জেলার সদর থানা, খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা জেলা এবং রাজশাহী জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে এই উদ্যোগের অনুরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা জেলায় এই কর্মসূচির সাথে আর্থ-সামাজিক মাত্রা যুক্ত করে ''আলোকিত চুয়াডাঙ্গা'' নামে নতুন ধরনের সার্বিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল কর্মসূচি প্রায় সর্বত্র অভাবনীয় সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনাময় ও ইঙ্গিতবাহী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

সারণি-৩

বিষয় ঃ গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের আগে ও পরে লালমনিরহাট জেলার শিক্ষা অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

মোট জনসংখ্যা ৯,২০,০০০ (১৯৯৪ সালের জরিপ অনুযায়ী)

শিক্ষিতের সংখ্যা	
কার্যক্রম গ্রহণের পূবে শিক্ষিতের সংখ্যা	১,৬৩,৯২৯ জন
কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে শিক্ষার হার	২৪%
কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর ৬-১১ বছর বয়স্ক স্কুলে ভর্তি শিশু	১,৫৮,৩৭৪ জন
১১-৪৫ বছর বয়স্ক কার্যক্রমের আওতায় সদ্য শিক্ষিত	২,৪৯,১৫২ জন
বর্তমানে মোট শিক্ষিতের সংখ্যা	৫,৭১,৪৫৫ জন
বর্তমানে জেলায় শিক্ষিতের হার	৮৫%
১-৫ বছর বয়স্ক শিশু সংখ্যা ২,৪৭,৯১১ জন।	

লালমনিরহাটে পরিচালিত সার্বিক গণস্বাক্ষরতা কর্মসূচিত সাফল্যের মূলে জনসাধারণের সাথে অব্যাহত যোগাযোগ, সভা সমাবেশ, প্রচারণা, উদ্বুদ্ধকরণ, সকলের অংশগ্রহণ, প্রতিবেদন প্রেরণের ব্যবস্থা, ঝড়ে পড়া রোধ করনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, নিরন্তর তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থাপনা, জনগণের সমস্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত করণ - সর্বোপরি নেতৃত্ব মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানে এই উদ্যোগের কিছু

নেতিবাচক দিকও দৃষ্টিগোচর হয়েছে । এই কার্যক্রমের প্রেক্ষিত, কর্মসূচির সাফল্য, ব্যর্থতা এসব কিছুর পর্যালোচনা এবং সুপারিশ এই সমীক্ষায় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সমীক্ষা পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা

২.১ সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি ঃ

নির্ধারিত এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সুফলভোগী, কার্যক্রম পরিচালনাকারী, এবং পৃষ্ঠপোষকসহ সর্বস্তরের মানুষের সাথে আলোচনা পর্যালোচনা করে এই প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে । অনুসন্ধান কালে জনসাধারণের সাথে ব্যাপক মতবিনিময় করা হয়েছে । গণশিক্ষা কেন্দ্র, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাটবাজার, সভা, সমিতি, সরকারি বেসরকারি দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ এবং এই কার্যক্রমের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ ও অন্যান্য সকল মানুষের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এই কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের প্রচেষ্টা চালানো হয় । কথপোকথন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর সুফলভোগিদের বাড়িতে/কর্মস্থলে গিয়ে নিবিড় আলোচনার মাধামে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ এই প্রতিবেদনের মূল উপজীব্য । মতামত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে । জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত সকল উপাত্ত গৃহীত হয়েছে, যা মাধ্যমিক উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত হবে । এছাড়া সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

২.২ সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা ঃ

লালমনিরহাট জেলার সবকটি থানায় একযোগে ১,২৯৭.৭৪ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে সাড়ে নয় লক্ষাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় এই স্বাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে । এই কর্যক্রম মুল্যায়নের জন্য জনবল, আর্থিক সামর্থ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক আনুকুল্য কোনটিই এই গবেষণা কার্যক্রমের জন্য সুলভ ছিল না । বিশেষতঃ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা,

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এই গবেষণা পরিচালনার পথ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল । এসকল বিরূপ প্রেক্ষাপট মোকাবিলা করে এই গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে । ফলে সমীক্ষাটির কাঙ্খিত মান নাও অর্জিত হতে পারে । স্বল্প সময়ে সমীক্ষা পরিচলনার এবং নিবন্ধ প্রণয়নের ফলে অনেকক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার স্বরূপ এবং চরিত্র বিশ্লেষণ এবং উন্মোচনে এই সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে ।

তৃতীয় অধ্যায়

লালমনিরহাট গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রারম্ভিক ইতিহাস

৩.১ লালমনিরহাট বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি ব্যাপক নিরক্ষরতা কবলিত এবং পশ্চৎপদ জেলা । এই জেলার বিভিন্ন স্তরের সচেতন মানুষ দীর্ঘদিন থেকে নিরক্ষরতা হতে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল । গবেষক ও উন্নয়ন প্রশাসন কর্মী সৈয়দ নকীব মুসলিম তাঁর একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা জনাব আজিজুল হক একজন লালমনির শহর এলাকায় ৪টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছিলেন । সন্ধ্যায় এই স্কুলগুলোতে পাঠদানের আসর বসতো । প্রতিটি স্কুলে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪০ এর মতো । দিনমজুর রিক্সাচালক, মহিলাশ্রমিক এরা ছিল এই স্কুলের শিক্ষার্থী । এছাড়া জেলার কালিগঞ্জ থানায় ব্যক্তি উদ্যোগে 'পরশ মণি' নামক একটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচিরও সন্ধান পাওয়া যায় । আরডিআরএস সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচির লক্ষ্যে পূর্ব থেকে কাজ করে আসছিল ।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন জেলায় কর্মরত সহকারী কমিশনার জনাব মোস্তফা কামাল । তিনি জানিয়েছেন লালমনির হাটের আর্থ-সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের

প্রথম দিকে জেলায় দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি ভিত্তিতে 'লালমনিরহাট ফাউন্ডেশন' নামে একটি শক্তিশালি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে ।' এই ফাউন্ডেশনের একটি অঙ্গ সংগঠন হিসেবে একই সময়ে জন্ম নেয় শিক্ষা ফাউন্ডেশন ।' শিক্ষা ফাউন্ডেশন জেলায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য বর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করে সেগুলোর

ক) প্রতি থানা থেকে ২ জন করে গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান;

খ) জেলা থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মেধাতালিকায় স্থান প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীকে স্বর্ণ পদক এবং সনদ প্রদান; এবং

গ) সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপাক উদ্যোগ গ্রহণ ।

উল্লেখ্য লালমনিরহাটে প্রাথমিক পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনের যে উদ্যোগ ১৯৯৩ সালে গড়ে উঠেছিল তার প্রারম্ভিক রূপকার এবং উদ্যোক্তা এই লালমনির হাট ফাউন্ডেশন ।' যখন জেলায় এধরনের একটি " অনুকূল প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল সে সময়েই লালামনির হাট জেলায় ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কাজী ফরিদ আহম্মদ এর আগমন । দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, দক্ষ এবং উচ্চাভিলাষী এই সরকারী কর্মকর্তা বুঝেছিলেন এই উদ্যোগটিকে সামনে তুলে ধরলে এলাকায় শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচির সফলতার পাশাপাশি সম্ভাবনাময় এককজন কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকেও তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হবেন । তিনি জেলায় ব্যাপক নির্বাহী ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে গণশিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ শুরু করেন । অনুভতা প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে লালমনিরহাটে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শিশু জরিপের সাথে বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের ওপর জরিপ সম্পন্ন হয় । জরীপের ফলাফল সারণী ৪ এ দেখানো হলো ঃ

সারণি-৪

বিষয় ঃ ১৯৯৩ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত জরিপের ফলাফল

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষিত	১,৬৩,৯২৯ জন	২৪%
নিরক্ষর জনসাধারণ	৫,০৮,১৬০ জন	৭৬%
জেলায় সার্বিক স্বাক্ষরতার হার	-	১৮%
জেলায় মোট কলেজ	১৩টি (৩টি সরকারি)	
মোট উচ্চবিদ্যালয়	৮৪টি (৬টি সরকারি)	
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯৩টি (৩২০টি সরকারি)	
মাদ্রাসা	২৩২ টি	
ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার	১টি (সরকারি)	
১১--৪৫ বছর বয়স্ক মোট নিরক্ষর	২,৬৮,১৩০ জন	
সূত্র ঃ সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন লালমনিরহাট এর ফলাফল বিবরণী ১৯৯৬ ।		

১৯৯৩ সালে ১৮ই মার্চ জেলায় কাজী ফরিদ আহম্মদ নতুন ডেপুটি কমিশনার হিসেবে যোগদানের পর তার বিশেষ উদ্যোগে ঐ বছরের ১৮ই এপ্রিল সাক্ষরতা বিস্তারের উপায় নিয়ে মতামত বিনিময় এবং আলোচনার সূত্রপাত হয় । ধীরে ধীরে এই আলোচনা ব্যাপকতা লাভ করে ।[৪] ফলে গণশিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন জেলায় এধরনের একটি মতামতের সৃষ্টি হয় । আলোচনায় মতামত বিনিময়ের পাশাপাশি গণশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে জেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ।

বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গ এই কর্মসূচির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন । বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদেরকে মতাদর্শের ভিন্নতাসত্ত্বেও এই কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করেন । শিক্ষা বিভাগ বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাকগণ এই কর্মসূচিতে

[৪] কাজী ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ, সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন প্রসঙ্গ, লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতি, ১৯৯৫

সহায়তা প্রদানে স্বতঃস্ফর্তঃ ও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন । জেলা, থানা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গণপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিও এই কর্মসূচির সমর্থনে এগিয়ে আসেন । ক্রমান্বয়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, ছাত্র/ছাত্রী ইমাম, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, ব্যবসায়ী, স্কাউট গ্রাম প্রতিরক্ষা কর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সর্বোপরি এলাকার মুক্ত মানসিকতাসম্পন্ন যুব সম্প্রদায়, শিক্ষিত তরুণ, তরুণীদের সহ সকলের অংশগ্রহণ ব্যাপক প্রাণসঞ্চার করে এই কর্মসূচিতে । এভাবে জনসাধারণের প্রকৃত সমস্যার ভিত্তিতে জেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত একটি পদক্ষেপ ব্যাপক গণভিত্তি অর্জন করে । জেলায় প্রাথমিক প্রর্যায়ে গড়ে উঠে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিক ৪২১টি গণশিক্ষা কেন্দ্র, যা ১৯৯৩ সালে লালমনিরহাট জেলা সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে । কর্মসূচির এই পর্যায় স্বেচ্ছাশ্রম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ।

৩.২ নমুনা এলাকা ও জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

লালমনিরহাটে প্রাচীনকালে প্রচুর তরমুজ ফলতো বলে জনশ্রুতি আছে । গ্রীষ্মকালে শান্তিদায়িনী এই ফলের অভ্যন্তরভাগ টকটকে লাল থাকে তাই অধিবাসীরা আদর করে এই ফলের নাম দিলো লালমনি । মৌসুমে লালমনিরহাট বাজার এই ফলে সয়লাব হয়ে যেতো তাই শহরটির নাম হয় লালমনির হাট । কেউ কেউ অবশ্য বলেন 'লালমুণি' নামে এক সাধুর নাম অনুসারে লালমনিরহাট - নামকরণ হয়েছে জেলার প্রধান শহরের । জেলার অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র । দরিদ্র ও বেকার জনসাধারণের কর্মসংস্থান অপ্রতুল, যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত ও সেকেলে, শিক্ষার হার অত্যন্ত কম । প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি শ্রমিকদের দৈনন্দিন মজুরী ১০-২০ টাকা । কৃষিপণ্যের দাম অকল্পনীয় রকম কম ।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সীমান্তবর্তী এই জেলার নাম লালমনিরহাট । আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পর্যায় বিবেচনা করলে বাংলাদেশের জেলাগুলোর মধ্যে নীচের সারির অন্যতম এই জেলা । এবং উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে এই জেলা টি সবচে পশ্চাৎপদ এবং অবহেলিত ।[5] নিরক্ষরতা এই জেলার উন্নয়নের সবচে বড় অন্তরায় ।

জেলাটি অপেক্ষাকৃত নতুন জেলা । এখানকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত । গণশিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হওয়ার আগে পর্যন্ত এই জেলায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন ঘটতো কালে ভদ্রে । ফলে তখন প্রটোকল দায়িত্ব পালন এবং আগত মাননীয় অতিথিদের জন্য কর্তৃপক্ষকে তেমন কর্মব্যস্ত থাকতে হতো না । অধিকন্তু প্রকৃতিগতভাবে লালমনির হাট জেলার অধিবাসীরা নিরীহ ও সরল প্রকৃতির । জেলায় কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে আগন্তুক বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা লক্ষ্যনীয়ভাবে বেশী । প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে এরা ক্রমান্বয়ে অধিকশক্তিশালী হয়ে উঠছে । ধীরে ধীরে স্থানীয় জনসাধারণের বিষয় আশয় ও সহায় সম্পত্তি এসব আগন্তুক অধিবাসিদের করতলগত হয়ে পরেছে । এ ধরনের একটি প্রেক্ষাপটে লালমনিরহাটে গণশিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৯৯৩ সালে ।

---

[5] Syed Naquib Muslim, District Administrations Role in Social Mobilization : The Case of Literacy Movement in Lalmonirhat, Journal of Administration and Diplomacy (Editor : Sultan Ahmed), Vol.3, No.1&2, January, 1995, BCS(Admin.) Dhaka. pp. 89.

সারণি-৫
লালমনিরহাট জেলার মৌলিক তথ্য

তথ্যের প্রকৃতি (১)		বিবরণ (২)
১	অবস্থান	২৫.৮ থেকে ২৬.৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৬ থেকে ৮৯.৬ পুর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত।
২	সীমান্ত	উত্তরে ভারতের কুচবিহার, দক্ষিণে রংপুর ও কুড়িগ্রাম, পুর্বে কুড়িগ্রাম ও ভারতের কুচবিহার, পশ্চিমে নীলফামারী ও ভারতের কুচবিহার।
৩	আয়তন	১,২৯৭.৭৪ বর্গকিলোমিটার
৪	জনসংখ্যা	৯,৫৩,৪৬০ জন
৫	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৭৩৪.৭০ জন, প্রতি বর্গকিলোমিটারে
৬	থানা	৫টি
৭	ইউনিয়ন	৪২ টি
৮	পৌরসভা	১ টি
৯	মৌজা	৩৭৪ টি
১০	গ্রাম	৫০০ টি
১১	নির্বাচনী এলাকা	৩ টি
১২	ভোটার	৫,১৮,৬২১ জন
১৩	ভোট কেন্দ্র	২৬৫ টি
১৪	মোট পরিবারের সংখ্যা	২,৮২,৩৬৭ টি
১৫	আবাদী জমি	৯১,৭৭১ হেক্টর
১৬	সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত জমি	৩১,৩৫০ হেক্টর
১৭	গভীর নলকূপ	২০৩ টি (চালু ৭৬ টি)
১৮	অগভীর নলকূপ	৩,১৬০ টি
১৯	হস্ত চালিত নলকূপ	৬,৩৪৭ টি
২০	প্রধান নদ/নদী	তিস্তা, ধরলা, সতী, সানিয়াজান প্রভৃতি
২১	অর্থকরী ফসল/সম্পদ	পাট, তামাক, আখ, বালি, পাথর
২২	গুরুত্বপুর্ণ ও দর্শনীয় স্থান	তিনবিঘা করিডোর, দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা, ছিটমহল, তিস্তা ব্যারাজ, বুড়িমারী স্থলবন্দর, মোগলহাট, চেকপোষ্ট, শালবন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিমান ঘাঁটি, বিভাগীয় রেলওয়ে সদর দপ্তর।
২৩	বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব	কবি শেখ ফজলল করিম সাহিত্য বিশারদ,(১৮৮৩-১৯৩৬), শেখ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ (১৮৩৮-১৯৭২) অধ্যাপক অনুল্যধন মুখোপাধ্যায় (১৯০২-১৯৮৪)

সূত্রঃ লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতি কর্তৃক প্রচারিত সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন লালমনিরহাট শীর্ষক প্রচার পত্র।

৩.৩ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ

১৯৯৩ সালে এবং ১৯৯৪ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ১৮,০০০ (আঠার হাজার) বয়স্ক নরনারীকে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা হয় । বিভিন্ন ব্যক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয় এই কর্মসূচি । ১ মাস, ২মাস, এবং ৩ মাস মেয়াদি বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা করা হয় এই পর্যায়ে । প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় । স্বেচ্ছাসেবা মূলক এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মোট ৪২১টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এসকল কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ অধিকাংশই ছিলেন বয়স্ক । স্বাক্ষরতা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রথমতঃ তারা টিপসহি মুক্ত হলেও অনেক কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা নিরক্ষরতা মুক্ত হয়ে মাতৃভাষার পাশাপাশি কিছুটা ইংরেজী শেখার আগ্রহ ব্যক্ত করে । এর মধ্য দিয়ে লালমনিরহাট জেলার নিরক্ষর জনসাধারণের মনে শিক্ষা অর্জনের সুপ্ত ব্যাকুলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এই ব্যাকুলতা ক্রমান্বয়ে প্রবল আগ্রহে রূপান্তরিত হয় । গভীর অর্ন্তদৃষ্টিসহকারে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন জেলার নবাগত ডেপুটি কমিশনার কাজী ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ । গণশিক্ষা কর্মসূচিতে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রধান । লালমনিরহাটে এসে তিনি প্রথমে জনগণের সমস্যা চিহ্নিত করেন সৃজনশীল উদ্যোগ কাজে লাগান । বিষয়টি সরকারকে অবহিত করা হয় । সরকারি আশ্বাসের প্রেক্ষিতে গণশিক্ষা কর্মসূচির প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গৃহীত হয় । বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় শিশু জরিপের পাশাপাশি ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর নারী-পুরুষ জরিপও সম্পন্ন করা হয় ডিসেম্বর ১৯৯৩ মাসে । এতে দেখা যায় এ জেলায় ২,৬৮,১৩০ জন নিরক্ষর ব্যক্তি রয়েছে । বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি ও ইউনিসেফ প্রতিনিধি দল উচ্চ পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (উনফেপ) এর নির্বাহী পরিচালক এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয় লালমনিরহাট জেলা পরিদর্শন করেন । তাঁরা ৪২১টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সরকারি সহায়তার আশ্বাস দেন । কেন্দ্রগুলোতে সবাই কাজ করছিলেন স্বেচ্ছায় । বিভিন্ন কেন্দ্রের পাঠ্যসূচি এবং পদ্ধতিতে কোন সামঞ্জস্য ছিল না । ফলে গণশিক্ষাকে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর

আওতায় এনে সারা জেলায় সম্প্রসারণের দাবি উত্থাপিত হতে থাকে বিভিন্ন মহল থেকে। সবাই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসেন একের পর এক।

ফলে গণশিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে উদ্যোগ গৃহীত হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক আন্দোলন ও সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পর্যায়ে থানা উন্নয়ন বাজেটের ২৫% পর্যন্ত শিক্ষা ও গণশিক্ষা খাতে ব্যয়ের অনুমোদন পাওয়া যায়। এই কর্মসূচিতে অনুপাতিক হারে সকল থানা উন্নয়ন কমিটি গণশিক্ষা খাতে ২৫% অর্থ বরাদ্দ অনুমোদন করে। পাশাপাশি পৌরসভা চেয়ারম্যান পৌর এলাকার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে ৪২টি ইউনিয়নের ৪২টি এবং পৌরসভার ৩টিসহ মোট ৪৫ টি ব্লকে৯৫৯টি গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সাক্ষরতার পাশাপাশি দৈনন্দিন হিসাবরক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ এবং উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক বিধায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ) কর্তৃক প্রকাশিত 'চেতনা' ১ম ও ২য় খন্ড 'পাঠ্যবই' হিসাবে মনোনীত হয়। ইনফেপ সকল কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় বই বিনামূল্যে সরবরাহ করে। কর্মসূচি বাস্তবয়ায়নের জন্য ৫টি প্রশাসনিক স্তর সৃষ্টি করা হয়ঃ ১) জেলা ২) থানা/পৌরসভা ৩) ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড ৪) ব্লক এবং ৫) কেন্দ্র।

জেলা পর্যায়ে সাধারণ কমিটি (৭০/৮০ সদস্য বিশিষ্ট) এবং কার্য নির্বাহী কমিটি (১০/১২ সদস্য বিশিষ্ট) গঠিত হয়। জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত জাতীয় সংসদ হুইপ, প্রধান উপদেষ্টা এবং জেলার সংসদ সদস্যবৃন্দ উপদেষ্টা, জেলা প্রশাসক উভয় কমিটির সভাপতি, পুলিশ সুপারসহ জেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের বিদ্যোৎসাহী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই কমিটির সদস্য হন। জেলা প্রশাসক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সমন্বয়ক হিসেবে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । জেলা কমিটির নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য স্তরগুলো পরিচালিত হয় । অতিরিক্ত জেশা প্রশাসক (সাঃ) কমিটি দুটোর সদস্য সচিব মনোনীত হন ।

থানা পর্যায়ে থানা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে এবং পৌরসভায় পৌর সভা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে অনুরূপ কমিটি গঠিত হয় । থানা শিক্ষা অফিসারগণ/পৌসভার সচিব এইসব কমিটির সদস্য সচিব মনোনীত হন । ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যান এবং পৌর ওয়ার্ডে পৌর কমিশনারের নেতৃত্বে কমিটিসমূহ গঠিত হয় । সরকারী এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এলাকা নিয়ে গঠিত হয় এক একটি ব্লক । সে এলাকার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান প্রধান অথবা ইউপি সদস্য কিংবা কোন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির নেতৃত্বে গঠিত হয় ব্লক কমিটি । সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোনীত হন ব্লক সুপারভাইজার এবং ব্লক কমিটির সদস্য সচিব । জেলার ৪২টি ইউনিয়নের ৪২টি ব্লক এবং পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডে ৩টি ব্লক নিয়ে গৃহীত হয় ৪৫টি ব্লকের কার্যক্রম । পরে দহগ্রামে আরেকটি কার্যক্রম গৃহীত হয় । ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে গঠিত হয় কেন্দ্র । পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে পুরুষদেরকেরাতে এবং মহিলাদেরকে দিনে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয় । প্রতি কেন্দ্রে একজন করে শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী এবং কেন্দ্র পরিচালনার জন্য গঠিত হয় কেন্দ্র কমিটি । স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি কেন্দ্রের সভাপতি এবং কেন্দ্র শিক্ষক সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন ।

সার্বিক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য বর্ণিত ৭টি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় ।

১) তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন ঃ সর্বস্তরের লোক নিয়ে গঠিত এই বিষয়ে কমিটি নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ।

২) ব্যবস্থাপনা ঃ জরিপ, স্বেচ্ছাসেবী সুপারভাইজার/ শিক্ষক নিয়োগ, কেন্দ্র নির্ধারণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন হয় । এবং শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয় ।

৩) পাঠ্যক্রম ঃ ৬ মাস মেয়াদী কোর্সের পাঠ্যক্রম নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হয় । লক্ষ্য সাক্ষরতার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবেশ সচেতনতা এবং উন্নয়নের ধারণা গড়ে তোলার উপযোগী পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা ।

৪) প্রশিক্ষণ ঃ প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা থেকে মাষ্টার ট্রেইনার এনে ৪৫জন ব্লক সুপারভাইজারকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় । সুপারভাইজারগণ পরে নির্বাচিত শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দেন । ফলে তাদের পক্ষে নির্ধারিত বই সুষ্ঠুভাবে পড়ানো হয়, কাঙ্খিত সচেতনতা সৃষ্টি , এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা সম্ভব হয় ।

৫) গণউদ্বুদ্ধকরণ ঃ জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত সব মানুষকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা, শিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং কেনেদ্র ধরে রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল কৌশল গ্রহণ করা হয় । মূল লক্ষ্য, শিক্ষার্থীদেরকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করে স্বেচ্ছায় কেন্দ্রে আনার ব্যবস্থা করা ।

৬) প্রশাসনিক ঃ গণশিক্ষা কার্যক্রমকে ৫টি প্রশাসনিক স্তরে বিভক্ত করে প্রতি স্তরে কমিটি করে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায়ের স্তরগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয় ।

৭) মুল্যায়ন ঃ কাজের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় । কেন্দ্র হতে শুরু করে প্রতিস্তরের জন্য সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের ব্যবস্থা করা হয় । প্রতিবেদন মুল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে পরবর্তী নির্দেশনা প্রদান করা হয় । কোর্স শেষে মূল্যায়নের মাধ্যমে ১০০% সাফল্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষককে প্রথম পুরস্কার (১৫০০ টাকা মূল্যমানের), ৯০% এর বেশি সাফল্যের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার (১৪০০ টাকা মূল্যমানের) এবং ৮০% এর বেশী সাফল্যের জন্য তৃতীয় পুরস্কার (১২০০ টাকা মূল্যমানের) দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় ।

৩.৪ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত বিভিন্ন পরিষদ ও কমিটি ঃ

উপরোক্ত কৌশলে ১২ই এপ্রিল ৯৪ থেকে ৪৫টি ব্লকে ৯৫৯টি কেন্দ্র চালু হয়ে যায় । ৬ মাস মেয়াদী এই কর্মসূচি সাফল্যজনকভাবে চলার সময় সরকার এই কৌশলকে কার্যকর হিসেবে বিবেচনা করে লালমনিরহাট জেলাকে প্রকল্প হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় । এরজন্য প্রকল্প ব্যয় বাবদ প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । মূল কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে করা হয় । শেষে সফল শিক্ষকদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয় । নভেম্বর ৯৪ থেকে প্রায় ৭ হাজার কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পুরো জেলাকে এই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয় । এই বিপুল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কৌশলগত পরিবর্তন সাধন করা হয় । সারা জেলাকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার জন্য গঠন করা হয় লালমনির হাট গণশিক্ষা সমিতি । এটি একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন । সমাজ সেবা অধিদপ্তর একে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করে (রেজিষ্ট্রেশন নং লাল/সদর/৬৬/৯৪) । এর কার্যক্ষেত্র সমগ্র লালমনিরহাট জেলা এবং এর ঠিকানা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ।

সমিতির লক্ষ্যজেলার ১১-৪৫ বছর বয়সী ২,৬৮,১৩০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করা, ৫ + বয়সী শিশু, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু, ১১-১৪ বছর বয়সী কিশোর কিশোরী ও ১৫-৪৫ বছর বয়সী লোকদের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং স্বেচ্ছাসেবী কেন্দ্র শিক্ষক ও নব্য সাক্ষরদের উন্নয়ন মূলক কাজে সংযুক্ত করা ।

সরকারি আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, আনসার, ভিডিপি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারি,স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীসহ সর্বস্তরের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ এই সমিতির সদস্য । সমিতির কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত ৪টি পরিষদ হল ঃ

১) সাধারণ পরিষদ , ২) কার্য-নিবাহী পরিষদ এবং ৩) উপদেষ্টা পরিষদ ।

জেলার রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধি, বিভন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান, মুক্তিযোদ্ধা ও সুধিমন্ডলী সমন্বয়ে ৭০-৮০ সদস্যের সাধারণ পরিষদ গঠিত হয় । জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে এর সভাপতি এবং একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন । সাধারণ পরিষদ আয় ব্যয়ের হিসেব অনুমোদন, নীতিমালা গ্রহণ, সম্পদের সংস্থান বাজেট অনুমোদন, গঠনতন্ত্রের সংশোধন প্রভৃতি কাজ করে ।

সাধারণ পরিষদের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, বিভিন্ন ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করা এবং সামগ্রিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য কার্য-নির্বাহী পরিষদ । জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে ২৮/৩০ সদস্য বিশিষ্ট এই পরিষদের সভাপতি এবং একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন । পরিষদের মেয়াদ কাল ১ বছর ।

এছাড়া সমিতির কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্য-নির্বাহী পরিষদকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয় । নির্বাহী পরিষদকে সহায়তা করার জন্য ৫টি উপ কমিটি গঠন করা হয় ঃ ১) প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ উপ কমিটি ২) মূল্যায়ন, মনিটরিং ও প্রকাশনা উপকমিটি ৩) প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উপকমিটি ৪) উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ উপকমিটি এবং ৫) অর্থ ও হিসাব উপকমিটি ।

জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় কাজ করার জন্য থানা/পৌরসভা, ইউনিয়ন, ব্লক ও কেন্দ্র পর্যায়ে বিভিন্ন পরিষদ গঠিত হয় । সকল পরিষদেই সরকারী, আধা সরকারী,স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, মুক্তিযোদ্ধা, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ সর্বস্তরের লোককজন জড়িত । থানা পর্যায়ে সৃষ্ট সাধারণ পরিষদ এবং স্বল্প সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট কার্য নির্বাহী পরিষদ, দুটি পরিষদেরই সভাপতি, থানা নির্বাহী অফিসার এবং সাধারণ সম্পাদক থানা শিক্ষা অফিসার ।

অনুরূপভাবে পৌর এলাকায় দুটি পরিষদ, সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ । দুটি পরিষদেরই সভাপতি চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সম্পাদক পৌরসভার সচিব ।

ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান দু'টি পরিষদেরই সভাপতি । দুটি পরিষদের জন্যই সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করেন থানা নির্বাহী অফিসার ।

ব্লক পর্যায়ে সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে । দুটি পরিষদের সভাপতি সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকার পৌর কমিশনার/ইউপি সদস্য অথবা একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি । সংশ্লিষ্ট ব্লক সুপারভাইজার/সরকারী অথবা রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উভয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ।

কেন্দ্র পর্যায়ে কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি । এই কমিটির সভাপতি ব্লক কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি । সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক কমিটির সদস্য সচিব । সকল পর্যায়ে যে সকল লোক এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত তাদের সবার লক্ষ্য গণশিক্ষা কতর্যক্রমকে সফল করে তোলা । এই কর্মসূচির মূল চালিকাকশক্তি স্বেচ্ছাসেবী কেন্দ্রশিক্ষক , ব্লক সুপারভাইজার, সহকারী ব্লক সুপারভাইজার, ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী, মুক্তিযোদখা, আনসার ভিডিপি, বেসরাকরী সংস্থা এবং সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ । যেহেতু সাক্ষরতার পাশাপাশি চেতনা ও দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে কেন্দ্রে আনা এবং থাকা নিশ্চিত করা হয় সেহেতু শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী ও ব্লক সুপারভাইজাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তা ও কমিটির সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় । সমিতির লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে পাঠ্যবই হিসেবে নির্বাচিত হয় ইনকেপ কর্তৃক প্রকাশিত চেতনা ১ম ও ২য় খন্ড । সা;ল্যজনকভাবে কোর্স সমাপ্ত করার পর তাদের পড়ার জন্য উপহার দেয়া হয় চেতনা তৃতীয় খন্ড ।' এই কর্মসূচি সফল করতে জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটিসহ সকল কমিটি প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে সহায়কশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে । পাশাপাশি নিরক্ষরদের উদ্বুদ্ধ করা হয় যাতে তারা কেন্দ্রে আসেন এবং শিক্ষাগ্রহণ অব্যাহত রাখেন । বিভিন্ন কমিটি এবং কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিত পরিদর্শন ও উদ্বুদ্ধকরণে নিয়োজিত থাকেন যাতে ঝরে পড়া রোধ করা যায় । কাজের অগ্রগতি নখদর্পণে রেখে

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রতিছবেদন প্রেরণ, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয় ।

৩.৫ বিশেষ কমিটি সমূহের কার্যক্রম ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদ সুস্পষ্ট দায়িত্ব সহ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ৫টি উপকমিটি গঠন করে । সব উপকমিটির সচিবালয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় লালমনিরহাট এ স্থাপিত হয় । উপকমিটিগুলো হচ্ছে ঃ

১) অর্থ ও হিসাব ২) উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ ৩) প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ৪) মূল্যায়ন, মনিটরিং ও প্রকাশনা ৫) প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ ।

৩.৬ সাক্ষরতা অভিযানে গণউদ্বুদ্ধকরণ কৌশল ঃ

এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা । অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ১১-৪৫ বছর বয়স সীমার নিরক্ষর লোদেরকে গণশিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে প্রচারণামূলক পদক্ষেপের দরকার । পূর্ব প্রস্তুতি মূলক প্রচারণার পাশাপাশি প্রকল্পের মাঝ পর্যায়ে যাতে করে কোন হতাশা না আসে সেজন্য সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় । জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ সভায় যোগ দেন । প্রচার ও প্রকাশনার কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয় ।

সাধারণ প্রক্রিয়া ঃ জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে নিরক্ষর ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্র তৈরী করে জরিপ কাজের সময় ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়া হয় (পরিশিষ্ট-১)।

আবেদন পত্রটিতে নিরক্ষর থাকার অসুবিধা এবং পড়াশুনার জন্য ধর্মীয় তাগিদকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় । আবেদন পত্রটি জরিপকারী সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রেজিষ্ট্রর্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক নিরক্ষর লোকদের নিকট পড়ে শোনান । গণশিক্ষার উপর বিভিন্ন শ্লোগান, পোষ্টার ও ব্যানার তৈরী করা হয় । গণশিক্ষার উপর গান, কবিতা, শ্লোগান প্রভৃতি সহকারে অডিও ক্যাসেট স্থানীয়ভাবে তৈরী করা হয় এবং মাইকে নিয়মিত বাজানোর ব্যবস্থা নেয়া হয় । ইনফেপ থেকে ঐ রূপ সংবাদকৃত ক্যাসেট যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় । হাট বাজারে ঢোল সহরতের মাধ্যমে মাঠে প্রচারের জন্য ইউনিয়ন/পৌরসভা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় । এছাড়া গায়কদক নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে ক্যাসেট বাজানোর ব্যবস্থা ছিল । আরডিআরএস প্রতি থানায় তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন গায়কদেরকে এ কাজে নিয়োজিত থাকবে ।

গণশিক্ষার উপর সরকারে থেকে যে সমস্ত পোষ্টার পাওয়া যায় সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্থানে লাগানো হয় । ক্ষেত্র বিশেষ স্থানীয় পর্যায়ে পোষ্টার , ব্যানার তৈরী করা হয় । স্থানীয়গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গণশিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি নিয়মিত বিবৃতি দিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পথসভা করেন । এ ব্যাপারে কেন্দ্র কমিটি, ব্লক কমিটি, ইউনিয়ন,পৌরসভা কমিটি সমূহ স্থানীয় উদ্যোগে ব্যবস্থা নেন । মাঝে মাঝে জেলা, থানা, পৌরসভ্যা কমিটির লোকজন ঐ সভাগুলোতে উপস্থিত থাকেন । সমাজের বিভিন্ন গ্রুপের প্রতিনিধিত্বকারী প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যাতে ঐসভাগুলোতে বক্তৃতা ও মত বিনিময় করেন সেদিকে খেয়াল রাখা হয় । কেননা সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে এদের কথা সবাই জোনেন এবং মানেন । ফলে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয় এ ধরনের পথসভা কেন্দ্র চালু হওয়ার আগে থেকে শুরু হয় এবং কর্মসূচি শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলে । কেননা ঝরে পড়া রোধ করার ক্ষেত্রে এ ধরনের সভার ভূমিকা অপরিহার্য ।

গণশিক্ষার উপর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের তৈরী তথ্যচিত্র প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রকল্প শুরুর আগে থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রদর্শন করার উদ্যোগ নেয়া হয় । প্রাপ্যতা সাপেক্ষে জেলা তথ্য অফিস এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করে ।

প্রকল্প চলাকালে সুস্থ মনোরঞ্জনের পাশাপাশি গণশিক্ষা বাস্তবায়নের বিভিন্নদিক দর্শকদের সামনে কর্মকান্ডের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় ।

হাট/বাজার, গুরুতত্বপুর্ণ স্থানে বোর্ড লিখনের ব্যবস্থা করা হয় । এ ধরনের বোর্ড প্রচার উপ-কমিটি স্থাপন করে ।

৩.৭ বিশেষ প্রক্রিয়া ঃ

স্থানীয় ভিত্তিতে সমাবেশ, সাইকেল মিছিল, মশাল মিছিলের ব্যবস্থা করা হয় । কেন্দ্র কমিটি, ব্লক কমিটি এবং ইউনিয়ন পৌরসভা কমিটিগুলো আয়োজন করে । এধরনের অনুষ্ঠান যাতে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে সেজন্য পুর্বে মাইকে প্রচার করা হয় ।

এই প্রক্রিয়ায় সমাজের সর্বস্তরের লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং জনগণের সচেতনতাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে । প্রকল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্লক এলাকায় এ ধরনের ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ।

প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রক্রিয়া ঃ

গণশিক্ষা কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এ ধরনের কার্যক্রম সংগঠিত করা হয় । কর্মসূচি চলাকালে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞকে এ ধরনের আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত করে তাদের

মূল্যায়ন , পরামর্শ ও নির্দেশনা লাভ করা হয় । থানা ও জেলা পর্যায় থেকে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

ক্লাস শুরুর আগে নিরক্ষরদের সবাই যাতে করে গণশিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হন সেজন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন । জেলা,, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন কমিটির সদস্যগণ, তারা এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন । জরিপকারীগণ জেলা প্রশাসকের আবেদন নিরক্ষর পরিবারের নিকট পড়ে শুনিয়ে ব্যাখা করেন । স্থানীয় ক্লাব সমিতিকে অনুরোধ করা হয় তারা যেন গণশিক্ষা কার্যক্রম চলাকালে নিয়মিতভাবে আলোচনা সভার আয়োজন করেন । এতে অশিক্ষিত ও শিক্ষিত লোকদের সম্মেলন ঘটে । ফলে তাদের চেতনা শানিত হয় । তাদেরকে কার্যক্রমে ধরে রাখতে সুবিধা হয় । এ কাজটি থানা পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ব্লক কমিটি সম্পাদন করেন ।

যে সমস্ত এলাকায় সাড়া কম সেসব স্থানে এ কর্মসূচি বেশী করে নেয়া হয় ।

সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া ঃ

এ ধরনের কর্মকান্ডের জন্য একাধিক শিল্পীগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা হয়েছে জেলা ও থানা পর্যায়ে । তাদের কাজ হচ্ছে নাটক, সংগীত প্রভৃতি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনগণকে গণশিক্ষা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা । ইউনিয়ন ও পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এ ধরনের অনুষ্ঠান করা হয় । অনুষ্ঠানের স্থান এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে করে সমস্ত এলাকা এর আওতায় চলে আসে । থানা পৌসভা কমিটি ইউনিয়ন ও ব্লক কমিটির সহায়তায় এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয় । আরডিআরএস এর সাংস্কৃতিক দল এবং অন্যান্য সংগঠন নিয়মিতভাবে গ্রাম পর্যায়ে এধরনের অনুষ্ঠান শুরু করে ।

অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

গণশিক্ষা কেন্দ্রে প্রতি সপ্তাহ অন্তর একবার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হয় । শিক্ষক নিয়োগ করার পর তিনি তার কেন্দ্রের নিরক্ষর লোকদের তালিকা পেয়ে যান । ফলে এদের মধ্যে আন্ত সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে যা পরবর্তীতে সমাজ গঠনে সহায়ক হয় । যে কেন্দ্র কমিটি তাদের এলাকার সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে সে কমিটি নিশ্চিত ভাবে সফল হয় ।

গণমাধ্যমে প্রচার ঃ

স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় যাতে গণশিক্ষা কার্যক্রমের খবরাখবর নিয়মিত পরিবেশন করা হয় সেজন্য তাদেরকে অনুরোধ করা হয় । এব্যাপারে পত্রিকাগুলো সার্বিক সহায়তা দেয় । জাতীয় দৈনিকে ও কিছু বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় । গণশিক্ষার সংবাদ গুরুত্বের সাথে ছাপানোর জন্য সকল জাতীয় দৈনিকের বার্তা সম্পাদককে অনুরোধ করে পত্র দেয়া হয় । রেডিও বাংলাদেশ, রংপুর এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনকে লালমনিরহাট গণশিক্ষা কার্যক্রমের উপর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয় । সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ও নির্বাহী পরিচালক সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম, ঢাকাকে টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয় ।

জরিপ ঃ

লালমনিরহাট জেলার নিরক্ষর লোকদের সংখ্যা ও অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষাদপ্তরের সহায়তায় জরিপ কাজ চালানো হয় । সকল সরকারী রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত এলাকাকে এক একটি ব্লক হিসেবে এবং বিদ্যালয়কে ব্লকের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । সরকারের বাধ্যতামূলক শিশু জরিপের পাশাপাশি ১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর লোকদেরও জরিপ করা হয় । সরকারী রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ স্বেচ্ছায় এই জরিপ কাজ করে দেন । সুষ্ঠু ও সঠিক জরিপ নিশ্চিত করা লক্ষ্যে শুরুর আগেই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিটি থানায় জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীসহ সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । ঐ সভাগুলোতে জরিপ কার্যক্রমে বিভিন্ন দিক বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং আশানুরূপভাবে জরিপ কাজ সম্পন্ন হয় ।

৩.৮- কার্যক্রমের কয়েকটি বিশেষ দিক ঃ

জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্লক এলাকার সম্ভাব্য কেন্দ্র শিক্ষকগণের নাম জানা যায় । প্রতি ৩০ জন নিরক্ষর লোকের জন্য একটি কেন্দ্র এবং প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একজন করে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নিয়োগ করা হয় । প্রতি জরিপাধীন এলাকার সরকারীরেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/বশক্ষয়িত্রী, স্বেচ্ছাসেবী ব্লক সুপারভাইজার এবং কর্মরত অবশিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী স্বেচ্ছাসেবী সহকারী ব্লক সুপারভাইজার হিসেবে নির্বাচিত ও নিযুক্ত হন ।

কেন্দ্র, কেন্দ্র শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক ও সুপারভাইজার নিয়োগ ও নির্বাচন ঃ

কেন্দ্র নির্বাচন এবং প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বর্ণিত কমিটি গঠন করা হয় ঃ

১)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
২)	ইউনিয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা	সদস্য
৩)	ব্লক এলাকার কর্মরত একজন এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
৪)	সংশ্লিষ্ট ব্লকের সভাপতি	সদস্য
৫)	সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী	সদস্য সচিব

পক্ষান্তরে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক ও সুপারভাইজার নির্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ঃ

১) ব্লক এলাকায় স্থানীয়ভাবে বসবাসকারী

২) স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী নির্ধারিত হয় কমপক্ষে এসএসসি পাশ

৩) এসএসসি পাশ কাউকে পাওয়া না গেলে অধ্যয়নরত বা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়

৪) উদ্যম, উৎসাহ, একাগ্র, দায়িত্ববোধ এবং সর্বজনগ্রহণযোগ্যতা মনোনয়নের সময় বিবেচনায় আনা হয়

৫) স্বেচ্ছাসেবী ব্লক সুপারভাইজার নিযুক্ত হন সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকার সরকারি/রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী । অন্যান্য শিক্ষক /শিক্ষয়িত্রী সহকারী ব্লক সুপারভাইজার হিসেবে মনোনীত হন

৬) প্রতি কেন্দ্রের জন্য একজন শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী নির্বাচন করা হয় । অপর একজন অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকবেন

৭) মহিলা কেন্দ্রের জন্য মহিলা শিক্ষয়িত্রী নির্বাচনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় । যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়

৮) যদি একটি এলাকায় একাধিক শিক্ষক না পাওয়া যায় তাহলে একই ব্যক্তিকে পুরুষ এবং মহিলা কেন্দ্রের জন্য মনোনীত করা হয়

৯) যদি সংশ্লিষ্ট এলাকায় উপযুক্ত লোক না পাওয়া যায় তাহলে নিকটবর্তী এলাকা থেকে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়

১০) শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীকে স্বেচ্ছাশ্রমে উদ্বুদ্ধ এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষাদান ও উদ্বুদ্ধকরণে অংশ নিতে হয়

১১) কেন্দ্র শিক্ষক ও সুপারভাইজারগণকে নিয়োগদানের সময় তাদের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গিকারপত্র গ্রহণ করা হয় যে তারা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে গণশিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হন ।

কেন্দ্র ঃ

জরিপের ফলাফল অনুসারে সম্ভাব্য স্থানসমূহে গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় । সাধারণভাবে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয় ঃ

১) প্রতি ৩০ জন পুরুষের জন্য একটি এবং ৩০ জন মহিলার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন

২) কেন্দ্রের স্থান হিসাবে স্কুল ভবন, গৃহ, ক্লাব, সমিতির অফিস , কারো বৈঠকখানা, ইউপি কার্যালয়, মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ইত্যাদি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হয়

৩) শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাসম্পন্ন স্থানেই কেন্দ্র স্থাপন করা হয়

৪) প্রতিটি কেন্দ্রে সন্ধ্যার পূর্বে মহিলাদের ক্লাশ এবং সন্ধ্যার পর পুরুষদের ক্লাশ (প্রতি ক্লাশ ২.৩০ ঘন্টা স্থায়ী) অনুষ্ঠিত হয়

৫) একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান সংকুলান সাপেক্ষে একের অধিক কেন্দ্রের ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়

৬) পুরুষ এবং মহিলা কেন্দ্র প্রয়োজনবোধে পাশাপাশিও স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয় ।

সুপারভাইজা ও কেন্দ্র শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ ঃ

এ গণশিক্ষা ধারণাটি প্রচলিত ধারণার চাইতে কিছুটা ভিন্নধর্মী । তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন ধ্যান ধারণা লাভের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সুপারভাইজার ও শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । যাতে করে প্রকল্পটি ঠিক সময়ে সুষ্ঠুভাবে শেষ হতে পারে । 'প্রশিক্ষণই দক্ষতা' এই মূলনীতিকে সামনে রেখে একটি প্রশিক্ষণসূচি তৈরী করা হয় । প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তায় আবাসিক ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবী সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । ১৯৯৪ পর্যন্ত ব্লক বিদ্যালয়ে অনাবাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্র শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । জেলার অবশিষ্ট এলাকায়র কেন্দ্র চালু করার জন্য প্রথমে প্রতি থানা থেকে ৪ জন করে মোট ২০ জন এবং আরডিআরএস এর ২০ জনসহ সর্বমোট ৩০ জন মাষ্টার ট্রেইনারকে সম্পূর্ণ আবাসিক ভিত্তিতে জেলা সদরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাষ্টার ট্রেইনারগণ থানা পর্যায়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় সকল ব্লক সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ দেন এবং গণশিক্ষা কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন । প্রশিক্ষপ্রাপ্ত ব্লক সুপারভাইজারগণ ব্লক এলাকায় সকল কেন্দ্র শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীকে অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দান ও উদ্বুদ্ধ করেন । এরপর প্রশিক্ষিত শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীগণ নিরক্ষরদের শিক্ষাদান শুরু করেন ।

ওরিয়েন্টেশন কোর্স ঃ

গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা কাজ করেন তাদেরকে নিজেদের লক্ষ্য, দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য ১/২ দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবস্থা করা হয় । এই ওরিয়েন্টেশন হয় জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও ব্লক পর্যায়ে ।

জেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্স পরিচালনা করে সমিতির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক এবং সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ । এতে অংশ নেয় সকল থানা নির্বাহী কর্মকর্তা , জেলা পর্যায় থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা, সকল থানা শিক্ষা অফিসার, পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং জেলার সকল ইউ পি চেয়ারম্যানগণ । থানা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্স পরিচালনা করেন থানা নির্বাহী অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার প্রমুখ । এতে অংশ নেন থানা থেকে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ ।

ইউনিয়ন পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্স পরিচালনা করবেন থানা নির্বাহী অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার এবং ইউ পি চেয়ারম্যান । এতে অংশ নেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এলাকার সকল ব্লক সভাপতি, ব্লককর্মকর্তা তথা কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীবৃন্দ । ব্লক পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্স পরিচালনা করেন পৌ চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান এবং তাকে সহায়তা করেন সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি । এতে অংশ নেন কেন্দ্র কমিটির সভাপতিবৃন্দ ।

পাঠ্যক্রম ও সূচি নির্বাচন ঃ

প্রতিদিনের ক্লাশের স্থায়িত্ব ২.৩০ ঘন্টা । সপ্তাহে ৫ দিন কেন্দ্র খোলা থাকে । স্থানীয় হাট বাজারের কাছাকাছি কেন্দ্র ২দিনের জন্য বন্ধ থাকে । তবে হাট বাজারের দিনেও মহিলা কেন্দ্রে ক্লাশ চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয় ।

কোর্সের মেয়াদকাল ৬ মাস । কোর্সের পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের মৌলিক প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ণীত কোর্সের মূল উদ্দেশ্য ঃ

১) নাম ঠিকানা সহ সহজ সরল বাক্য পড়তে/লিখতে শিখানো ;

২) ব্যক্তিগত হিসাব রাখতে শিখানো ;

৩) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ;

৪) পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;

৫) পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি;

৬) উন্নতজাতের ফসল ফলানো সম্পর্কে জ্ঞান দান;

৭) বিশ্লেষণী মনোভাব সৃষ্টি ;

৮) আত্মকর্ম সংস্থানের ব্যাপারে উৎসাহিতকরণ।

এর সাথে সংগতিপূর্ণ বলে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তর কার্যক্রম(ইনফেপ) কর্তৃক সরবরাহকৃত "চেতনা" ১ম ও ২য় খন্ড শিক্ষার্থিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং পড়ানো হয় ।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা তাদের প্রশিক্ষণ লব্ধ শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করেন । শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীদের মাধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় । গণশিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে কেন্দ্রসমূহে স্বল্পমূল্যের বর্ণিত উপকরণসমূহ ব্যবহৃত হয় (সারণি-৬) ।

সারণি-৬

বিষয় ঃগণশিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ ঃ

কেন্দ্র পর্যায়	ব্লক পর্যায়	ইউনিয়ন পর্যায়
ক) শিক্ষক হাজিরা খাতা;	ক) উদ্বুদ্ধকরণ উপকরণাদি খাতা; লিফলেট পোষ্টার, ব্যানার, মশাল ইত্যাদি	ক) পরিদর্শন বই
খ) শিক্ষার্থী হাজিরা	খ) রেজুলেশন বই	খ) রেজুলেশন বই
গ) মজুদ বহি;	গ) প্রতিবেদন সংক্রান্ত বই	গ) প্রতিবেদন সংক্রান্ত নথি
ঘ) পরির্দশন বহি;		ঘ) উদ্বুদ্ধকরণ উপকরণাদি
ঙ) বই, ব্লাকবোর্ড, দাষ্টার, হ্যারিকেন, কেরোসিন ইত্যাদি।		

উল্লিখিত স্তগুলো ছাড়া থানা, পৌরসভা, জেলা পর্যায়ের কেন্দ্রগুলোতে অনুরূপ উপকরণাদি ব্যবহার করা হয় । সম্প্রতি লালমনিরহাটে অব্যবহৃত গণশিক্ষা প্রকল্পের যে কাজশুরু রয়েছে তার একটি পরিসংখ্যা সারণি-৭ এ দেখা যেতে পারে ঃ

সারণী-৭

লালমনির হাট গণশিক্ষা সমিতি (লাগস)কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাবলি
মৌলিক শিক্ষা (৬-১০), কিশোর-কিশোরী (১১-১৪) ও গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র (লাইব্রেরী)

ানার নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা		চালুর তারিখ	মেয়াদ	শিক্ষক সংখ্যা		সুপারভাইজার সংখ্যা	তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মন্তব্য
	মৌলিক	কিঃকিশোরী			মৌলিক	কিঃকিশো	মন্তব্য	মৌলিক	কিঃকিশো	উভয় কর্মসূচির.
ালমনিরহাট দর	৭০	৫১	জুন/জুল ।'৯৫	২বছর	৭০	৫১		২১০০	১৫৩০	মেয়াদ
াদিতমারী	৩৭	৩১	ঐ	ঐ	৩৭	৩১	০৯	১১১০	৯৩০	কমিয়ে
ালিগঞ্জ	১৮	৩৪	ঐ	ঐ	১৮	৩৪	০৮	৫৪০	১০২০	৩১-১২-
াতিবান্ধা	৩৯	৩৪	ঐ	ঐ	৩৯	৩৪	০৮	১১৭০	১০২০	৯৬ পর্যন্ত
াটগ্রাম	২৪	৩৪	ঐ	ঐ	২৪	৩০	১০	৭২০	৯০০	করা
পীরসভা, ালমনিরহাট	০২	X	ঐ	ঐ	০২	X	০৭	৬০	X	হয়েছে ।
মাট	১৯০	১৯০			১৯০	১৮০	০১	৫৭০০	৫৪০০	

গণশিক্ষা ও সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত অব্যাহত গণশিক্ষত কার্যক্রমে সকলের প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে পাঠশালায় নিয়মিত উপস্থিতি, ও ঝরে পড়া রোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ, কমিটিগুলোকে সক্রিয়া রাখা, জরুরী ভিওিতে উপরকণ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, অনগ্রসর শিক্ষার্থির প্রতি মনোআোগ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় ।

বিশেষ উদ্বুদ্ধকরণ ঃ

শিক্ষার্থীসহ জনগণের বিভিন্ন অংশ থেকে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় । সেটি হল গণশিক্ষা গ্রহণ করে কি লাভ ? এর যথার্থ উওরের মাধ্যমেই প্রকৃত উদ্বুদ্ধকরণ অনেকটা সম্পন্ন হয় । জেলা কমিটি থেকে শুরু করে সকল কমিটি কর্মকর্তা, ব্লক সুপারভাইজার এবং স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষককেই এর জবাব দিতে হয় । এ প্রশ্নের উত্তরে ধর্মীয় তাগিদ এবং দৈনন্দিন জীবনে গণশিক্ষার উপকারিতা তুলে ধরা হয় । সংযোজিত হয়েছে পরিশিষ্ট-১ ।

সামগ্রিকভাবে বিভিন্নস্তরের লোকদের মধ্যে গণশিক্ষার ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলার পর বিশেষ উদ্বুদ্ধকরণ শুরু হয় । প্রথমে প্রশিক্ষণকালে ৪৫ জন সুপারভাইজারকে উদ্বুদ্ধ করা হয় । তারা উদ্বুদ্ধকরণ সভাতেই এই কর্মসূচি সফল করা জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন । এর পর থানা ভিত্তিতে দিনব্যাপী বিভিন্ন দলে উদ্বুদ্ধকরণ সভা হয় । এতে সকল সুপারভাইজার, শিক্ষক, বিভিন্নস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিভিন্ন দল, গ্রুপ সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের লোক অংশগ্রহণ করেন এবং এ কর্মসূচিকে সফল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন ।

ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার এবং কর্মকর্তাবৃসদ ব্লক পর্যায়ের বিশেষ উদ্বুদ্ধকরণ সভায় যোগ দেন । এতে বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্লকের সুপারভাইজার, শিক্ষক, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, কমিটি সমূহের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য

ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষার্থীগণ যোগ দেন । এতে তাদের গণশিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়ে বলা হয় । তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয় এবং উদ্ভুত সমস্যাবলী সমাধানের বাস্তব চেষ্টা করা হয় ।

৩.৯ পরবর্তী কর্মসূচি ঃ

সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পর লালমনির হাটে বর্তমানে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি চালু হয়েছে । স্বেচ্ছাসেবী কেন্দ্র শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীসহ নব্য সাক্ষরদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার কিছু পরিকল্পনা রয়েছে এতে ৬+ ও ঝড়ে পরা রোধ, ১১ থেকে ১৪ বছরের কিশোর কিশোরী শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় । প্রতি ১টি কেন্দ্রের জন্য ১রটি করে লাইব্রেরী স্থাপন করে সমিতির কর্তৃত্বাধনি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (সারণি ৭ ও ৮ দ্রষ্টব্য)

চিত্র- ১
কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে ও পরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির থানা-ওয়ারী চিত্র

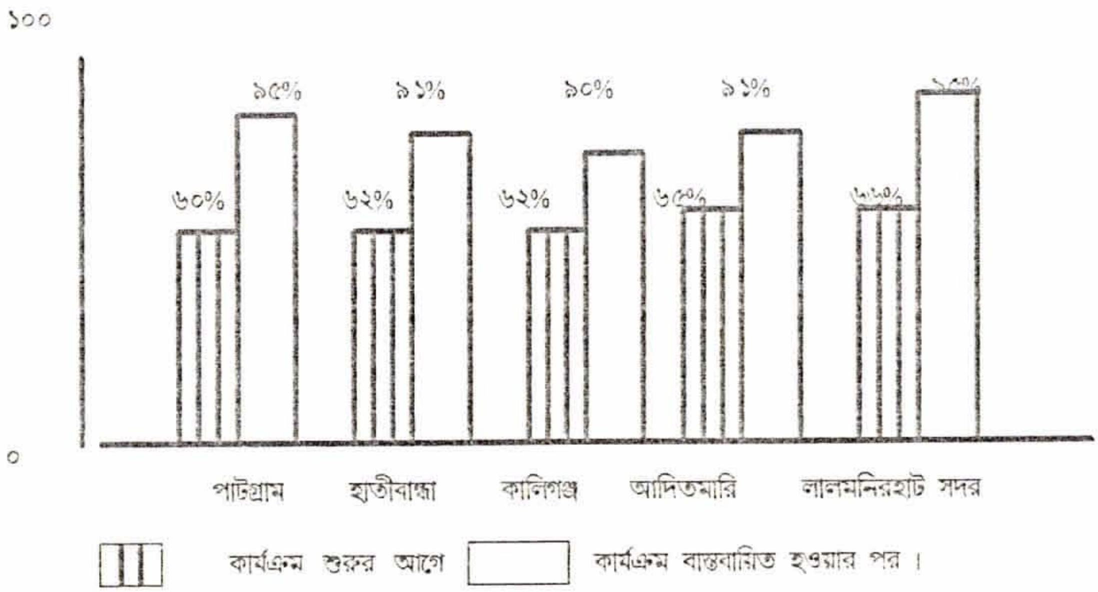

চতুর্থ অধ্যায়

কর্মসূচি পর্যালোচনা

স্মরণ করা যেতে পারে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ নিরক্ষর। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ খুব জটিল। সরকারী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের প্রাণান্ত প্রচেষ্টার পরও জাতীয় ভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে লক্ষ্যণীয় কোন অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না যেখানে, সেখানে একটি জেলায় এই উদ্যোগের ঈর্ষনীয় সাফল্যের পেছনে কি কি কারণ নিহিত থাকতে পাতে তা খুঁজে বেরা করা জরুরী। এই সাফল্যের কারণ চিহ্নিত করা সম্ভব হলে তা অন্যত্র প্রয়োগের সহজ প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করবে। পক্ষান্তরে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের ত্রুটি বিচ্যুতি, সমস্যাসমূহ ও সীমাবদ্ধতাও খুঁটিয়ে দেখতে হবে। বিশেষতঃ এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন পদ্ধতি খুব ভালভাবে পর্যালোচনার দাবী রাখে। উল্লিখিত বিবেচনা সমূহের আলোকে এখানে উদ্যোগটির বৈশিষ্ট্য, সাফল্য এবং ব্যর্থতা একে একে আলোচনা করা হলো।

৪.১ সফলতা ঃ

ক) এই উদ্যোগে প্রথম সফলতা হলো জনসাধারণের মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করে লালমনিরহাটের মতো একটি অনগ্রসর জেলায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা সম্পর্কে সম্ভাবনা আবিস্কার করা। কারণ বাংলাদেশের সকল জনপদে এবং জেলাগুলোই নিরক্ষরতার চরম অভিশাপে জর্জরিত। লালমনিরহাটও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এখানকার জনসাধারণ এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তীব্র আকাঙ্খা পোষণ করছিল এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে কিছু কিছু পদক্ষেপ শুরু করেছিল। জেলার কর্তৃপক্ষের বিচক্ষণতার পরিচায়ক হলো তাঁরা এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত আগেই মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

খ) দ্বিতীয়তঃ সম্ভাবনা বুঝতে পেরে কোন সময় অপচয় না করে দ্রুত কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় এই বিশাল কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থায়ন ও উপকরণ সরবরাহের কোন উৎসের সন্ধান জানা ছিলনা। উদ্যোক্তাদের কাজের নিশানাই তাদেরকে পথের সন্ধান দিয়েছে।

গ) লালমনিরহাটে গণসাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা জেলাব্যাপী একটি ব্যাপক ও বিশাল কর্মযজ্ঞ সংঘটনে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। জেলার চাপারহাট, তুষভান্ডার, চাকলারহাট, গোড়ল, পাটিকাবাড়ি, চন্দ্রহর, বড়বাড়ি, শষ্টিবাড়ি, দূর্গাপুর, বলাইরহাট, বুড়িমারি, বুড়িরহাট, কচলিরহাট, হররাম, নামড়িহাট, আদিতমারি, ভুরুঙ্গামারি, কালিগঞ্জ পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা, দহগ্রাম, আঙ্গুরপোতা, মোগলহাট, প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক ভ্রমণ, আলাপ চারিতা ও অবস্থা পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে এই কর্মসূচি চূড়ান্ত পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। গৃহবধু, তরুণী, বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শিশু যুবক প্রৌঢ়া, বৃদ্ধাসহ সকল পেশা ও শ্রেণীর মানুষ এই কর্মসূচিতে তাদের একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

ঘ) প্রাথমিক ভাবে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ শুরু হলেও পরবর্তী পর্যায়ে গোটা জেলাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে লালমনিরহাট গণ স্বাক্ষরতা কর্মসূচির একটি নিজস্ব কাঠামো গড়ে তোলা হয়। অনুসৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতেই এই কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল (সংগঠন ছক দেখুন)।

চিত্র - ১

লালমনিরহাটের গণসাক্ষরতা কার্যক্রমের

সংগঠন চিত্র

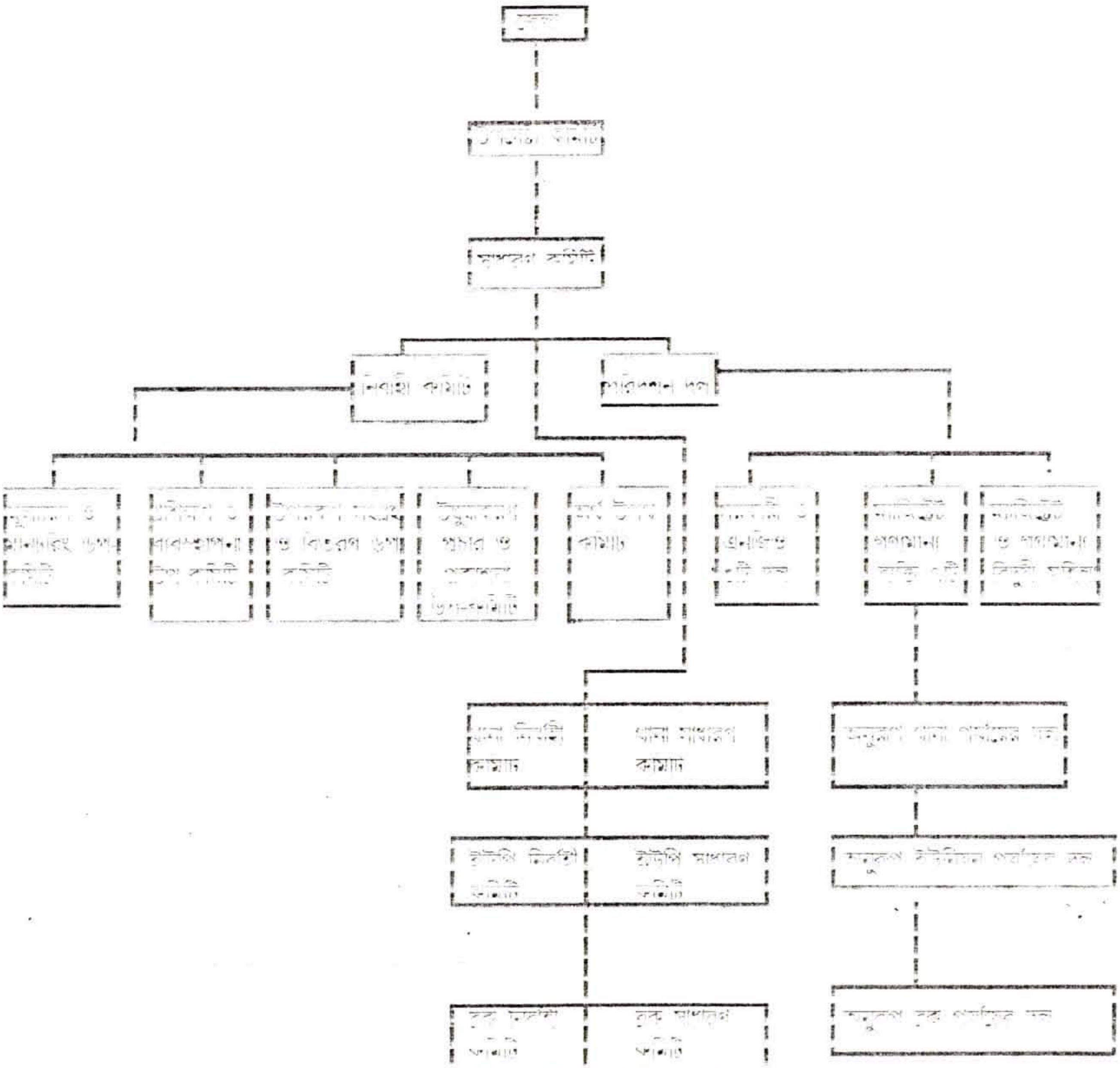

ঙ) শুধুমাত্র স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়ন করেই এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি, সরকারকে ঐ কর্মসূচিতে ব্যাপক আর্থিক সহায়তা প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যাপক তৎপরতা চালানোর মাধ্যমে লালমনিরহাটে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে । অনেক স্থানীয় উদ্যোগের মতো তাই এই কর্মসূচি বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত না হয়ে জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারার সাথে যুক্ত হয়ে অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ।

চ) অব্যাহত যোগাযোগ, নিয়মিত সভাসমাবেশ, নিয়মিত প্রচার, সর্বস্তরে, উদ্বুদ্ধকরণ, সকলের অংশগ্রহণ, নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ, ঝরে পড়া রোধ করা, সুশৃংখল তত্ত্বাবধান, নিয়মিত পরিদর্শন এবং সর্বোপরি ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা এই কর্মসূচির মৌলিক চালিকা শক্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছে ।

ছ) লালমনিরহাট জেলায় সার্বিক গণসাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলার তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার কাজী ফরিদ আহম্মদ ছিলেন প্রাণপুরুষ । তাঁর সবল ও যোগ্য নেতৃত্ব কর্মসূচিকে বেগবান করেছে । তিনি এই জেলায় ডেপুটি কমিশনার নিয়োজিত হওয়ার আগে কুমিল্লাতে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সম্ভবত এধরনের বড় উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এভাবে তিনি দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন । সৎ, দেশপ্রেমিক এবং কাজপাগল বলে তার খ্যাতি রয়েছে এই জেলায় ।

জ) এই কর্মসূচির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো সারা জেলার সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে যা খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি, আঞ্চলিক এবং ক্ষুদ্র দলভিত্তিক বিচ্ছিন্ন কোন উপাদান ছিলনা এই কর্মসূচিতে । যে কারণে বেসরকারি অথবা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহের এধরনের উদ্যোগের থেকে পৃথক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে এই কর্মসূচির মাধ্যমে ।

ঝ) গণস্বাক্ষরতার এই কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । নারী বা মা শিক্ষিত হলে পরিবারের শিক্ষার তাগিদ বৃদ্ধি পায় এই বিবেচনা বোধ থেকে । নারীদেরকে অচলায়তন ভেঙ্গে তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানোর ক্ষেত্রে এই কর্মসুচি তাই সর্বাধিক সফলতা অর্জন করেছে । চিত্রে দেখা যাচ্ছে জেলার সর্বত্রই মহিলারা গণশিক্ষা কার্যক্রমে অধিক হারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন

চিত্র-২

কেন্দ্রে শিক্ষার্থী উপস্থিতির থানাওয়ারী বিবরণ

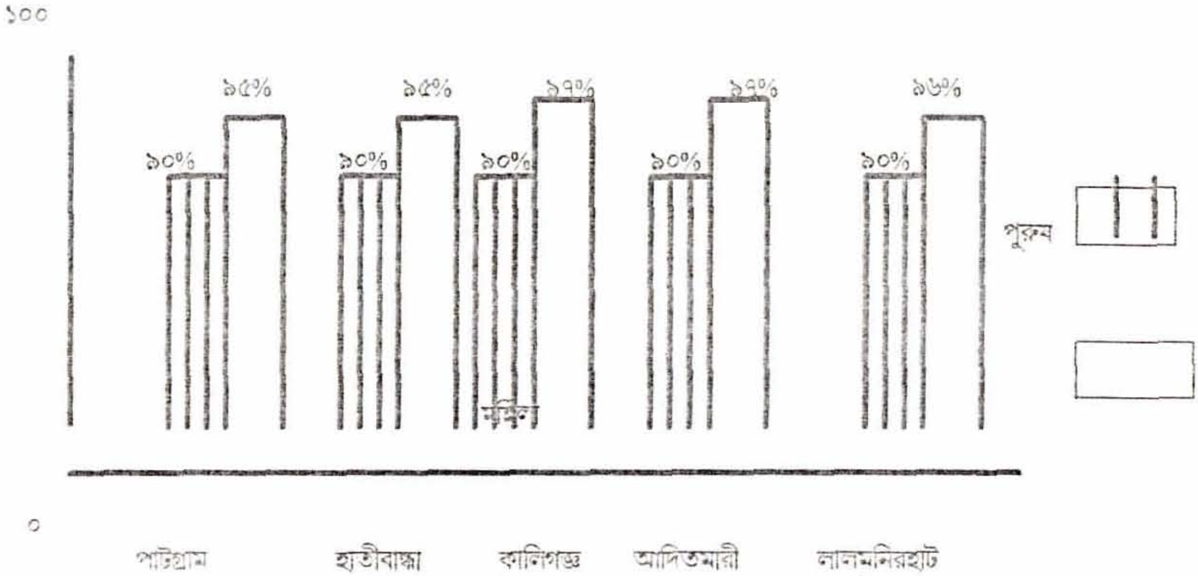

সূত্র ঃ লালমনিরহাট ডেপুটি কমিশনারের তথ্য বোর্ড থেকে সংগৃহীত ।

ঞ) লালমনিরহাটে আইনানুকূল শৃংখলা পরিস্থিতি এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।

ট) লালমনিরহাট গণসাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলার সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নেতৃত্ব দিলেও এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন এনজিও এবং রাজনৈতিক দল স্বতঃস্ফূর্ত ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করে । ফলে সরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী বিভাগ সমূহের কাজের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা ও সমন্বয়ের একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে । এক্ষেত্রে লক্ষ্যে সুস্পষ্টতা ও অর্জনের একাগ্রতা সকলের মনের দ্বিধা দ্বন্দকে অপসারিত করেছে । এভাবে উন্নয়ন প্রশাসন ধারণার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত হয় লালমনিরহাট।

৪.২ উদ্যোগের কতিপয় সীমাবদ্ধতা ঃ

লালমনির হাট জেলায় চূড়ান্ত পর্যায় সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা শেষে সার্বিকভাবে গণশিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের চূড়ান্ত মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয় । এতে দেখা যায় কর্মসূচি শুরুর আগে জেলায় শিক্ষার হার ২৫% থাকলেও কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর তা উন্নীত হয়ে ৮৫% এ দাড়ায় । সর্বস্তরের কর্মচারি, শিক্ষক, জনসাধারণ প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার কোন কোন লোক এই পরিসংখ্যানে সন্দেহ প্রকাশ করেন । তাদের যুক্তি বাস্তবে এই হারে শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁদের লোকালয়ে নেই - তবে তারা বলেন এই হার সম্ভবত ৭০-৭৫% এর বেশী হবেনা । অবশ্য তাদের এই দাবীর তথ্য নির্ভর প্রমাণ হাজির করতে তারা ব্যর্থ হন । তবে দহগ্রাম, গোড়ল, বড়বাড়ি, প্রভৃতি ইউনিয়নে তাৎক্ষণিক দৈবচয়িত পদ্ধতিতে অতি ক্ষুদ্র আয়তনের নমুনার ওপর জরীপ চালিয়ে দেখা গেছে এসব স্থানে গড়ে ৭৫% জনসাধারণ নিরক্ষরতা মুক্ত হয়েছেন ।

ক) এই কর্মসূচিকে অনেকে উচ্চাকাঙ্খী এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করেন । এর পেছনে অনেক যুক্তি দিয়েছেন তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার তার স্বল্পকালীন অবস্থান সময়ের মধ্যে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অনেক সময় অযাচিত এবং অযৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন । তারা মনে করেন কর্মসূচিটি আরও পূর্ণতা পেতে পারতো যদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে আরো ২ বছর বেশী সময় দেয়া হতো । তাদের মতে ডেপুটি কমিশনার নিজের কর্মকালিন সময়ে চমক সৃষ্টির একটি প্রয়াস হিসেবে এই কর্মসূচিকে ব্যবহার করেন এই কাজের জন্য পরবর্তীতে তিনি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন ।

খ) এই উদ্যোগ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের নেতৃত্ব প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণকারী ছিল । স্থানীয় উদ্যোগের ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সরকারি কর্মকান্ডে হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন । যেমন উদ্যোগ

পরিচালনার জন্য যে কাঠামো গড়ে তোলা হয় সেখানে দেখা যায় জেলা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ, ও কার্যনির্বাহী পরিষদের একক কর্তৃত্ব ডেপুটি কমিশনারের হাতে, তিনি উভয় পরিষদেরই সভাপতি । এছাড়া জেলা পর্যায়ে গঠিত মোট ৮টি পরিষদ এবং উপকমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, অবধায়ক ও সদস্য সচিব পর্যয়ে সকল পদই জেলার সরকারী কর্মকর্তারা অলঙ্কৃত করেছেন । শুধুমাত্র সদস্য পদে এবং সহ সভাপতি ও যুগ্ম-সদস্যসচিব পদে ২/১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি স্হান পেয়েছেন । থানা পর্যায়ে , ইউনিয়ন পর্যায়ে, ব্লক পর্যায়ে গঠিত কমিটি গুলোতেও অমলা প্রাধান্য এবং নির্ভরতা বুঝতে কারো বাকী থাকেনা । (সারণি-৯ ও ১০) । তাই জনগণের প্রকৃত অংশগ্রহণ এই কার্যক্রমে নিশ্চিত হয়নি বলে অনেকে মনে করেছেন । তবে জেলার জনসাধারণ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির এবং শান্তিপ্রিয় তারা আমলা নির্দেশিত পর্থ অনুসরণ করার ফলে এই কর্মসূচি আপাতঃ সাফল্য লাভ করে বলে অনেকে মনে করেন ।

সারণি- ৯

বিষয় ঃ জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটিতে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

পরিষদ/কমিটি	সভাপতি/সহসভাপতি	সাধারন সম্পাদক/সদস্য সচিব	অন্যান্য সদস্য
সাধারন পরিষদ (সদস্য সংখ্যা ঃ ৮০ জন)	সভাপতিঃ ডেপুটি কমিশনার সহসভাপতিঃ পুলিশ সুপার	জেলা প্রশাসক মনোনীত একজন অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির্বগ
কার্যনির্বাহী পরিষদ (সদস্য সংখ্যা ঃ ১২ জন)	সভাপতিঃ ডেপুটি কমিশনার সহসভাপতিঃ ১) পুলিশ সুপার ২) ডেপুটি কমিশনার মনোনীত একজন গন্যমান্য ব্যক্তি	একজন অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার সভাপতি কর্তৃক মনোনীত	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক - একজন এডিসি, জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সরকারী অন্যান্য কর্মকর্তা , কলেজ শিক্ষক এবং বিভিন্ন দপ্তরের ২০ জন নির্বাহী সদস্য ।
উপদেষ্টা পরিষদ (সদস্য সংখ্যা ঃ ৫ জন)	প্রধান উপদেষ্টা ঃ সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রতিমন্ত্রী	-----	জেলার চার জন সংসদ সদস্য
অর্থ ও হিসাব উপ কমিটি (সদস্য সংখ্যা ঃ ১৬ জন)	আহ্বায়ক ঃ ১ জন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য সচিব ঃ ১জন সহকারী কমিশনার	বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ
উপকরন সংগ্রহ ও বিতরন উপকমিটি (সদস্য সংখ্যা ঃ ১৭ জন)	আহ্বায়ক ঃ অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব)	সদস্য সচিবঃ ১জন সহকারী কমিশনার যুগ্ম সদস্য সচিবঃ রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ
প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উপকমিটি (সদস্য সংখ্যা ঃ ১৯ জন)	আহ্বায়ক ঃ অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার সার্বিক	সদস্য সচিব ঃ ১ জন সহকারী কমিশনার যুগ্ম সদস্য সচিবঃ জেলা সমন্বয়কারী, ইনফেপ	বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ
মুল্যায়ন, মনিটরিং ও প্রকাশনা উপকমিটি (সদস্য সংখ্যা ঃ ৩২ জন)	আহ্বায়ক ঃ সচিব, জেলা পরিষদ	যুগ্ম সদস্য সচিবঃ ১জন সহকারী কমিশনার যুগ্ম সদস্য সচিবঃ ১ জন সহকারী কমিশনার	বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ
প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ উপকমিটি (সদস্য সংখ্যা ঃ ৪৬ জন)	আহ্বায়ক ঃ সচিব, জেলা পরিষদ	সদস্য সচিবঃ সহকারী কমিশনার যুগ্ম সদস্য সচিবঃ জেলা তথ্য কর্মকর্তা	কর্মকর্তা,গণমাধ্যম কর্মী এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

সারণি- ১০

বিষয় ঃথানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, ব্লক, কেন্দ্র পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

পরিষদ/কমিটি	সভাপতি/সহসভাপতি	সাধারণ সম্পাদক/সদস্য সচিব	অন্যান্য সদস্য
সাধারণ পরিষদ থানা/পৌরসভা পর্যায়ে	সভাপতিঃ থানা নির্বাহী অফিসার/পৌসভা চেয়ারম্যান	সাধারণ সম্পাদকঃ থানা শিক্ষা অফিসার	রাজনৈতিক দলের নেতা, মুক্তিযোদ্ধা, সকল ইউপি চেয়ারম্যান, পৌর কমিশনার, ব্যাংক সমুহের প্রধান, এনজিও প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ
কার্যনির্বাহী পরিষদথানা/পৌরসভা পর্যায়ে	সভাপতিঃ থানা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভা চেয়ারম্যান	সাধারণ সম্পাদকঃ থানা শিক্ষা অফিসার সম-সাধারণ সম্পাদকঃ সভাপতি কর্তৃক মনোনী একজন কর্মকর্তা	ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভা কমিশনার, থানা/পৌরসভা পর্যায়ের প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্লকের সভাপতি/সম্পাদক
সাধারণ পরিষদ ইউনিয়ন পর্যায়ে	সভাপতিঃ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান	সাধারণ সম্পাদক ঃ টি এনও কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি	ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা সকল সদস্য মুক্তিযোদ্ধা, ইউনিট কমান্ডার, আনসার বিভিন্ন দলনেতা, বিভিন্ন ক্লাব/সমিতির প্রধান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং ৩জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)
কার্যনির্বাহী পরিষদ ইউনিয়ন পর্যায়ে	সভাপতিঃ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান	সাধারণ সম্পাদক ঃ টি এনও কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি	সকল ক্লাব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আপ সদস্যবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ
সাধারণ পরিষদ ব্লক পর্যায়ে	সভপতিঃ পৌর চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত পৌর কমিশনার অথবা ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সদস্য /গণ্যমান্য ব্যক্তি	সাধারণ সম্পাদকঃ সরকারী/বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অথবা ব্লব সুপারভাইজার অথবা উৎসাহী ব্যক্তি	গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ব্লকের সকল স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক
কার্যনির্বাহী পরিষদ ব্লক পর্যায়ে	ঐ	ঐ	সভাপতি ও সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত ৪৫ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সকল কেন্দ্র কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি কেন্দ্র পর্যায়ে	সভাপতিঃ ব্লক কমিটি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য সচিবঃ কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক/শিক্ষিকা	অনধিক ১০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি

গ) তদানীন্তন সরকারি প্রশাসনের কতিপয় ব্যক্তিসহ অনেকেই মনে করেন এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে কখনও কখনও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু কিছু অযাচিত ও অবাঞ্ছিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ।

যেমন গণশিক্ষা কেন্দ্র সমূহ সন্ধ্যায় বসতো বলে ঘোষণা দিয়ে লালমনিরহাট জেলার সকল হাটবাজার ও দোকানপাট সন্ধ্যা ৮টার মধ্যে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে । অনেকে একে মৌলিক অধিকার খর্বকরার সামিল বলে অভিমত প্রকাশ করেন । আদিতমারী থানার একটি হাট জোর জবরদস্তি করেও শেষ পর্যন্ত বন্ধ করা যায়নি । এখানে ২ জন সহকারী কমিশনার অপদস্ত হয়েছিলেন উত্তেজিত জনতা কর্তৃক । এই থানা ওটিএনও এই কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদানে বিরত ছিলেন ।

তিস্তা বাজারে দোকান বন্ধ করতে গিয়ে একজন সহকারী কমিশনার একবার দোকানদার দ্বারা ঘেরাও হয়ে যান । কোথাও কোথাও গণশিক্ষা কার্যক্রমে অসহযোগিতার কারণে Special Power Act ব্যবহার করা হয়। এবং অনেককে রংপুর জেলা হাজতে প্রেরণ করা হয় । কারণ ঐ সময়ে লালমনিরহাটে কোন জেলখানা ছিলনা । লালমনিরহাট জেলা সদরের ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এর সভাপতি জনাব আবুল হোসেন সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধের বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন - ফলে শহরে একপর্যায়ে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল ।

ঘ) এসকল কার্যক্রমের অনেকগুলিকে জনসাধারণ দূরে নিরব দর্শকের ভূমিকায় দাড়িয়ে দেখেছেন । অনেকে একে বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করেছেন । অনেকে মনে করেন এই কর্মসূচি দূরবর্তী অঞ্চলে কর্মকার্যকরী হয়েছে ।

ঙ) এই কর্মসূচি বাস্তবয়নের কঠিন সময়ে অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে যারা সহায়তা দিয়ে এই কর্মসূচিকে বঁচিয়ে রেখেছিলেন সরকারী ৪ কোটি টাকার অনুদান ঘোষণার পর তাঁদের অনেকের আর এই কর্মসূচিতে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় নি বলে কেউ কেউ জানিয়েছেন । বরং যারা দুর্দিনে এই কর্মসূচির চরম বিরোধিতা করেছে, বিপুল সরকারী অর্থ বরাদ্দর পর তাদেরই কেউ কেউ এই কর্মসূচির কর্ণধার হিসেবে উঠে অসেন যা অনেককে হতবাক করে । তাছাড়া সরকারী দপ্তরে কর্মরত যুবক ও নবীন কর্মকর্তারা এই কর্ম.সুচি বাস্তবায়নে নিবেদিত প্রাণে কাজ করলেও তারা এর যোগ্য প্রশংসা অথবা পুরস্কার কখনও পায়নি বলে অনেকের মনে চাপা ক্ষোভ ছিল ।

চ) এই কর্মকান্ডের চূড়ান্ত বা তৃতীয় পর্যায়ে ৪ কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে। জেলার কোন কোন মহল মনে করেন এই অর্থের সঠিক ব্যবহার করা হয়নি । তাদের মতে এই অর্থের লুটপাট হয়েছে কতিপয় অমলা কর্তৃক ।

ছ) এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটি বড় সমস্যা ছিল জনসাধারণের দারিদ্র । ধুলিঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কর্মসূচিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্থ করে ।

জ) সারাদেশের প্রশাসনে প্রকৃচি বনাম প্রশাসন ক্যাডারের দ্বন্দ্ব এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে কখনো কখনো অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ।

ঝ) নিম্ন শ্রমজীবী জনসাধারণের কাজের জন্য স্থানত্যাগ জনিত কারণে অনেক সময় এইকর্মসূচি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।

ঞ) শিক্ষক শিক্ষিকাদের পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা একদিকে যেমন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের মনে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে অপরপক্ষে কোথাও কোথাও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানা যায় । যেমন, কোন কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা পুরস্কার প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা পুরণের জন্য পূর্বেই শিক্ষিত লোকদেরকে এনে পরীক্ষা দিয়েছিল । কোন কোন ক্ষেত্রে একই কুমিরের ছানা বার বার দেখানো হয়েছে । কোন কোন স্কুল ওকলেজ শিক্ষক বলেছেন তারা সনুপারভাইজার নিয়োজিত হলেও অনেক সময়ই লোকজন চেনা না যাওয়ার কারণে তারা এধরনের ঘটনা জানা থাকা সত্ত্বেও রোধ করতে সমর্থ হননি ।

ট) অনেকে জানিয়েছেন জনসাধারণ যেটুকু স্বাক্ষরজ্ঞান অর্জন করেছিল ফলোআপ কর্মসূচি না থাকায় তারা তা আবার ভুলে যাবে । যদিও ইনকেপ বর্তমানে কাজ করছে তবে তা সারা জেলার প্রয়োজনের তুলনায় অনুজীব সদৃশ্য ।

৪.৩ উপসংহার

লালমনিরহাট গণসাক্ষরতা কর্মসূচির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতোমধ্যে দেশের অন্যত্র কয়েকটি অনুরূপ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে । ঐ সকল কর্মসূচির মূল্যায়ন হলে এই পদ্ধতির অন্যত্র প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে । লালমনিরহাটে গৃহীত কর্মসূচির বিশাল সফলতার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সীমাবদ্ধতা ও বিদ্যমান । কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্যত্র যেসব জায়গায় বিষয়টি পুনঃপরীক্ষিত হয়েছে, সে সকল স্থানে এই সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার সচেতন প্রয়াস থাকলেও একটি মৌলিক জায়গায় বড় ধরনের গলদ থেকেই যাচ্ছে । আর তা হলো আমলা নির্ভরশীলতা- এর হাত ধরে চমক সৃষ্টি এবং কিছু অনিয়মের উত্তরাধিকারও বিদ্যমান রয়ে যায় ।

এধরনের সমস্যা সত্ত্বেও বলতেই হবে অন্ধকার তমশাচ্ছন্ন রাত্রির বুকে লালমনিরহাট বিদ্যুতের উজ্জ্বল ঝিলিক। আমাদের প্রচেষ্টা হোক এই ভিত্তিকে সংরক্ষিত করে আলোকিত বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা। এ ধরনের কার্যক্রমের ওপর ব্যাপক অধ্যায়ন ও গবেষণার বিষয়ে সুধিমহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্য সূত্র

১. সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন লালমনিরহাট এর ফলাফল বিবরণী ১৯৯৩।

২. গণশিক্ষা নির্দেশিকা, লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতি।

৩. সবার জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন, লালমনিরহাট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট।

৪. Syed Naquib Muslim, District Administrations Role in Social Mobilization : The Case of Literacy Movement in Lalmonirhat, Journal of Administrative and Diplomacy (Edicted by Sultan Ahmed) Vol. 3 No.1 &2, January-December, 1995.

৫. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, উন্নয়নে স্থায়ী উদ্যোগ ঃ একটি দৃষ্টান্ত, প্রশাসন সাময়িকী, চতুর্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ৯৩, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৬. লালমনিরহাট জেলার ও থানা পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ ও শ্রমজীবী জনসাধারণের নিকট থেকে পাপ্ত তথ্য ও পরামর্শ।

৭. লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন দপ্তরের জনসাধারণ।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে লালমনিরহাট জেলাবাসীর নিকট জেলা প্রশাসকের আবেদন ।

শিক্ষাই জাতীর মেরদন্ড ইহা নতুন কথা নয় ; পুরাতন কথা, শিক্ষিত ; অশিক্ষিত সকলের কথা । লেখাপড়া না জানা অভিশাপ স্বরূপ । আধুনিক যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। লেখাপা না জানিলে এই প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে থাকা যাইবে না । জীবনে উন্নতি করা যাইবে না । অজ্ঞতার জন্য পদে পদে ঠকিতে হইবে । দৈনন্দিন জীবনে নানা রকম বিপদে পড়িতে হইবে । কোন প্যাকেটে ঔষধ আর কোন প্যাকেটে বিষ তাহা প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে । পড়িতে না জানিলে ভুল করিয়া ঔষধের জায়গায় বিষ খাইয়া মরিবার ভয় থাকে । কোন জমিতে কত সার দিতে হইবে, কি জাতীয় কীটনাশক ঔষধ দিতে হইবে পড়িতে না জানিলে তাহা ঠিক মত বুঝা যায় না । ফলে ফসলের ক্ষতি হইয়া যাইতে পারে । লেখাপড়া না জানিলে কৃষিকাজ হইতে শুরু করিয়া ড্রাইভারী, মেকানিক, ইলেকট্রিকের কাজ ইত্যাদি ঠিকমত শিখা যায় না । বিদেশে চাকুরীর জন্য যাইতে হইলে ভাষা শিখিতে হয় । লেখাপড়া না জানিলে নিজের ভালমন্দ জানা যায় না । লেখাপড়া না জানিলে ব্যবসার লাভ লোকসান হিসাব করা যায় না । যদি কেহ বড় ব্যবসায়ী হইতে চাহে, তাহা হইলেও লেখাপড়া জানিতে হয় । উন্নতজাতের গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পালন , মাছের চাষ প্রভৃতির জন্যও লেখাপড়া জানা দরকার । জমির খাজনা দেওয়া, দলিল করা, নামজারী করা, জমা খারিজ করা ইত্যাদি কাজে লেখাপড়া লাগে । পড়িতে না জানিলে এইসব বুঝা যায় না । না বুঝার সুযোগে ঠকবাজ লোকেরা আপনার জমি পর্যন্ত জাল দলিল করিয়া লইয়া যাইতে পারে । আপনাকে বিপদে ফেলিতে পারে । লেখাপড়া না জানার কারণে টিপসই লইয়া চালাক স্বামী, স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে । ফলে লেখাপড়া না জানা স্ত্রীকে পথের ভিখারিনী হইতে হয় ।

ব্যাংক হইতে ঋণ লইতে হইলেও লেখাপড়া জানিতে হয় । আপনি যদি ঠিকমত ধর্মকর্ম পালন করিতে চান তাহা হইলে নিজ ধর্ম বিষয়ক বই যথাঃ কোরান , হাদিস, বেদ, বাইবেল পড়িতে হইবে । ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা জানিতে হইলেও নিজে না পড়া ছাড়া উপায় নাই ।

এইভাবে দেখা যায় , আপনার কৃষিকাজ, ব্যবসা, চাকুরী প্রতিটি কাজের জন্যই লেখাপড়া জানা প্রয়োজন । সেই জন্য প্রতিটি ধর্মে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় ।

প্রতিটি উন্নত দেশই তাহাদের উন্নয়নের কাজ শুরু করিয়াছে শিক্ষা দিয়া । শিক্ষার গুণেই তাহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে, ব্যবসা বাণিজ্যে, সামরিক শক্তিতে উন্নত । আমেরিকা, জাপান, জার্মানী, ইংলন্ড, কানাডা, কোরিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশে প্রায় শতকরা একশত জনই শিক্ষিত ন আরবদেশগুলিতে তৈল বিক্রয়ের টাকা দিয়া শিল্প কারখানার পাশাপাশি শিক্ষার উপর জোর দিয়াছে । কারণ শিক্ষা না থাকিলে কারখানা চালাইবে কি করিয়া । সাউদি আরবে শতকরা ৫২ জন শিক্ষিত । তাহারা বাকী সবাইকে শিক্ষিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে । শিক্ষাই উন্নয়নের পূর্বশর্ত ।

অন্য দিকে পৃথিবীর সব গরীব দেশে শিক্ষার হার কম । শিক্ষা নাই বলিয়া তাহার গরীব, বাংলাদেশও শিক্ষা নাই বলিয়া গরীব । লালমনিরহাট জেলার প্রতি একশত জন লোকের মধ্যে মাত্র ১৮ জন শিক্ষিত, নারী শিক্ষার হার আরও কম । বাকী ৮২ জন অশিক্ষিত । অশিক্ষিত বলিয়াই এই জেলার লোকজন চাকুরী, ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পিছাইয়া আছে । অশিক্ষার কারণে দারিদ্র বাড়ি.তেছে, বাড়িতেছে কুসংস্কার। এই জেলায় ১১ হইতে ৪৫ বছবর বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ২,৬৮,১৩০ জন ।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ(সাঃ) এর উপর প্রথম যে আসমানী ওহী অবর্তীণ হয় সেই ওহীর প্রথম আদেশ ইবাদত করা নয়, নামাজ পড়া নয়, সেই ওহীর পথম আদেশ ''ইক্‌রা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক''। অর্থাৎ পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন । ৪র্থ আয়াত ' আল্লাজি আল্লামা বিল কালাম'' ।অথাৎ যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন । পড়ার সম্পর্ক রহিয়াছে কাগজের সাথে, বই পুস্তকের সাথে । দেখা যাইতেছে মানব জাতির প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ আসিয়াছে পড়িবার জন্য । আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন , প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ । অতএব, যিনি লেখাপড়া শিখেন না তিনি আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ অমান্য করেন । তাই সকলের অবশ্য কর্তব্য লেখাপড়া করা । লেখাপড়া শুধু ছোট বেলায়ই করা যায় ইহা সত্য নয় । সারা জীবনই লেখাপড়া করা যায় । নবীজী (সাঃ) বলিয়াছেন, লেখাপড়ার সময় হইল দোলনা হইতে কবর পর্যন্ত । অর্থাৎ নবীজী (সাঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন মৃত্যু পর্বন্ত লেখাপড়া চালাইয়া যাইতে হইবে । লেখাপড়া শিখিলে গরীব থাকিতে হইবে না । টাকার অভাবে কষ্টও করিতে হইবে না ।

হিন্দু ধর্মাবলম্বিদের পবিত্র শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতায় বলা হইয়াছে, ''অজ্ঞ শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি ধ্বংস হইয়া যায় । সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখও নাই (জ্ঞান যোগঃ ৪০ সংখ্যক শ্লোক) ''। অথাৎ যাহার মধ্যে শিক্ষা থাকিবে না সে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না । ফলে সে জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে না ।

দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার জন্য সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে । মাননীয় প্রধান মন্ত্রির কার্যালয়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম নামে একটি বিশেষ সেল গঠন করা হইয়াছে । স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সকল সরকারী দপ্তরে কর্মকর্তা–কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছে ।

আসুন, কাল বিলম্ব না করিয়া আমরা আমাদের নিকটবর্তী অশিক্ষিত আত্মীয়-স্বজন, পাড়া -প্রতিবেশী সকলকে গণশিক্ষা কেন্দ্রে পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া তুলি । দেশ ও সমাজের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করি । শিক্ষা লাভের মাধ্যমে নিজেকে , সমাজকে, পরিবেশকে, জাতিকে ও দেশকে জানি । পরম করুণাময় আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলকের সহায় হউন । খোদা হাফেজ ।

কাজী ফরিদ আহাম্মদ

জেলা প্রশাসক,

লালমনিরহাট

বিঃদ্রঃ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, মসজিদ, মাদ্রাসা, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রধানগণকে আবেদনটি স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে সকলের মধ্যে এবং বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক প্রচার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি

পরিশিষ্ট-২

কেন আপনি 'গণশিক্ষা' কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক/সুপারভাইজার হবেন ?

১) লালমনিরহাট জেলাকে একটি অবহেলিত জনপদ হিসাবে অখ্যায়িত করা হয়। আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে লালমনিরহাটকে নিরক্ষরতার কবল থেকে মুক্ত করে দেশের প্রথম নিরক্ষতা মুক্ত জেলার গৌরবজনক আসনে অধিষ্ঠিত করুন এবং আপনি এই বিরল সম্মানের অংশীদার হউন।

২) ১৯৭১ সালে ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ করে যাঁরা দেশ ও জাতির কাছে বীরের মর্যাদা পেয়েছেন তাঁদেরই মতো এ ছয় মাসের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জেলাবাসীর নিকট চিরদিন শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকুন।

৩) প্রতিটি ধর্মের মূল কথা হচ্ছে পরস্পরের সেবা করার মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধন। আপনি আপনার জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ৬টি মাস এ মানবকল্যাণের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করুন।

৪) প্রতিবেশির ট্যাক্সের টাকায় আপনি শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রতিবেশিকে শিক্ষিত করে তোলা আপনার একটি সামাজিক দায়িত্ব। নিরক্ষর প্রতিবেশিকে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবা করার সুযোগ নিন।

৫) থানা ও জেলা পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী সুপারভাইজার/শিক্ষকমন্ডলির নাম ও তালিকাভুক্ত করে সংরক্ষণ করা হবে। এ তালিকা সরকারের নিকটও প্রেরণ করা হবে। আপনিও একজন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক/সুপারভাইজার হিসাবে নিজের নামটি তালিকাভুক্ত করুন।

৬) গণশিক্ষা সফল সমাপ্তিতে আপনাকে ১টি প্রশংসাপত্র প্রদান করা হবে। এই প্রশংসাপত্রে সামাজিক একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে আপনাকে স্বীকৃতি দেয়া হবে এবং চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে আপনাকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হবে।

৭) গণশিক্ষা সফল সমাপ্তিতে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।

৮) স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবী সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীগণের নিকট ছাড়াও সমাজের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়ে থাকবেন ।

৯) আপনার সাথে জনসাধারণের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হবে । ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ আত্মকর্মসংস্থানের কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে চাইলে ও সম্মিলিতভাবে কোন কর্মকান্ড পরিচালনা এবং প্রয়োজন বোধে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় মূলধনের জন্য ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ।

১০) গণশিক্ষার ফলে সমাজে কুশিক্ষা/অশিক্ষাজনিত কারণে সংঘটিত অপরাধ সমূহ অনেকাংশে কমে যাবে । এই গৌরবে আপনি একজন সম্মানজনক অংশীদার হবেন ।

১১) ভবিষ্যতে আপনাকে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হবে । ফলে আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হবে । সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে আপনি স্বীকৃত হবেন ।

১২) শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুবিধ ঃ অশিক্ষিত জনগণ শিক্ষিত হয়ে উঠলে তাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে নিজেরাই সচেষ্ট হবেন । শিক্ষার মাধ্যমে তাদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে । শিক্ষিত হলে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হয়ে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করাত পারবে বেকার সমস্যার সমাধান হবে ।

১৩) যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে আপনাকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে ।

১৪) 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর জন্য ফরজ'' এবং অপরকে শিক্ষাদান ছাদকায়ে জারিয়া । আপনার অর্জিত জ্ঞান অপরের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে তাকে জ্ঞান অর্জনে তথা ফরজ আদায়ে সাহায্য করে অশেষ পূণ্যের অংশীদার হউন ।

১৫) তোমাদের মধ্যে তিনি উত্তম যিনি জ্ঞান/বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন ও অন্যকে/ শিক্ষা দেন '' অন্যকে শিক্ষাদানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসুন এবং সমাজ ও জাতির নিকট উত্তম ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত হবার সুযোগ গ্রহণ করুন ।

১৬) নিরক্ষরদেরকে সার্থকভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে আপনি নিজেও আরো অধিকতর শিক্ষায় সমৃদ্ধ হবেন ।

১৭) শতকরা ৮২ জন নিরক্ষরকে শিক্ষিত করা সম্ভব হলে আপনার নিজের অস্তিত্বও সংরক্ষিত থাকবে ।

১৮) আপনার, আমার, সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে লালমনিরহাট জেলার সকল অধিবাসী নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার অভিশাপ হতে মুক্ত হয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাক এই প্রত্যাশা করছি ।

কাজী ফরিদ আহাম্মদ
জেলা প্রশাসক,
লালমনিরহাট ।

পরিশিষ্ট -৩

লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতি
চূড়ান্ত মুল্যায়ন পরীক্ষা ১৯৯৫
পূর্ণমান -১০০

(প্রশ্নপত্রেই উত্তর দিতে হবে)

১) উত্তর লিখুন ঃ ১৫

ক) জরিনা কিসের বাগান করে ? উত্তর
খ) সমাজে কার মর্যাদা দিতে হবে ? উত্তর
গ) কোন বাড়ি দেখতে চমৎকার ? উত্তর
ঘ) কে দল পরিচালনা করেন ? উত্তর
ঙ) সবাই সচেতন হলে কি কমবে ? উত্তর

২) বাক্য গঠন কর ঃ ১৫

ক) চেতনা
খ) পরিবার
গ) জুলুম
ঘ) একতা
ঙ) জমি

৩) শুন্যস্থান পুরণ করুন ঃ ১৫

ক)..................ক্ষেতের কাজ করেন ।
খ) সমাজের অর্ধেক...........................।
গ)......................টাকার হিসাব রাখব ।
ঘ) নারী পুরুষ সবাই ....।
ঙ) টিকা দিলে শিশুর..........টি রোগ হয় না।

৪) অংকঃ ১০

ক) ৭৭ ÷১৩ -----------	খ) ৮৩ - ২১ ------------	গ) ৮ ×২ --------	ঘ) ১৫-৩- ৩ =

৫) মানসাংক ঃ ১৫

ক) আমার দৈনিক আয় ৩৫ টাকা ব্যয় ৩০ টাকা হলে দৈনিক জমা কত ? উত্তর ঃ..............

খ) ২ সপ্তাহে কত দিন ? উত্তর ....
গ) একটি কুমড়ার দাম ৪টাকা হলে ৩টির দাম কত ? উত্তর ....
ঘ) এককেজির দাম ১০ টাকা হলে ৫০০ গ্রামের দাম কত ? উত্তর ....
ঙ) ১ ঘন্টায় কত মিনিট ? উত্তর ....

৬) দেখে দেখে লিখুন ঃ ১৫

না জেনে কাজ করলে বিপদ । না জেনে কোন কাজ করব না । নিজের বিপদ আনব না ।

শিক্ষার্থীর নাম ঃ.......... ক্রমিক নং.............. ৫

কেন্দ্র নং............ ব্লক নং............ ইউনিয়ন..............

আপনি টিউব ওয়েলের পানি পান করেন কি ? উত্তর ....

আপনি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করেন কি ? উত্তর ....

গণশিক্ষা কার্যক্রমের চড়ান্ত মূল্যায়নের ফলাফল বিবরণি (১৯৯৬)
থানা ঃ আদিতমারী

ইউনিয়নের নাম	ফলাফল (শিক্ষার্থীর সংখ্যা)							কেন্দ্র গ্রেড (পাশের হার অনুযায়ী)				
	গ্রেড-১ (৯০-১০০ নম্বর)	গ্রেড-২ (৮০-৮৯ নম্বর)	গ্রেড-৩ (৬০-৬৯ নম্বর)	অকৃতকার্য ৬০ নম্বরের নীচে	শুধুমাত্র সহি জানেন	সম্পূর্ণ খাতা অন্যের লেখা	অনুঃ	৯৫-১০০% কেন্দ্র নং	৯০-৯৪ % কেন্দ্র নং	৮০-৯০ % কেন্দ্র নং	অকৃত কার্য ৮০% নীচে	পাশের হার
পলাশী	৬৩১	১৮২২	১৪৮৫	৬৭	২৯৫	৪০৪	১৯৬	৭৬	৩৪	৭০	১২	৮৬%
ভেলাবাড়ী	২২৪	৯৯৫	২৬২৪	১৫৩	১০০	৩৭৩	১০৮	২৮	২২	১০১	০৩	৮৩%
কড়বাড়িয়া	১১৯২	১২৮৯	১১২৯	১২৩	১২	২৭৩	১৭	৩৯	১৫	৭৯	০৫	৮৭%
কমলাবাড়ী	১৩০৩	১২০৮	১৩৬১	১৪৭	১১৩	১৪৩	৮৪	৭৯	২৪	৩৯	-	১০০%
দুর্গাপুরা	১৩১১	১২৮৫	১৩৯৫	৫৩	১১৭	৪৩১	১২০	৪৯	৩৮	৫৫	১০	৮৫.৫০%
ভাদাই	১৩৬০	১২১২	১৬০৯	৭৪	৮৩	১৯৭	৪৯	৮৩	২৭	৪১	০২	৯২.১৯%
সাপ্টীবাড়ী	৪৪৪	১২২০	১৭৭৯	১১	৩৫	২৬৯	৭৪	৬৬	০৮	৪৬	০৫	৮৬.৬৭%
সারপুকুর	১০১৪	১৩৫৭	৩২০৯	৮৮	১৩৭	৩৭০	৫১	১১৫	১২	৬৭	১২	৯০%
মহিষখোচা	১২২৬	১০৩১	১০৬০	১৭২	৯৭	২৪২	২৫	৫৪	১৮	৪২	১২	৮১%
মোট	১৭৫১৩	১০১০০	১৫৫২২	৮৬৫	৯৭৪	২৫২৯	৭৩৪	৫৫০	১৮৩	৪৬১	৫৬	৮৮%

মোট কেন্দ্র সংখ্যা ১২৭৫৯। মোট পাশের হার ৮৮%। পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে নাই এমন কেন্দ্র সংখ্যা ১৯। মোট শিক্ষার্থী ৩৮৯১০ জন। মোট শিক্ষিত ৩৪৯৭৭ জন। শিক্ষার্থী ৬৫০ জন। কেন্দ্র সমুহ পরে শুরু হয়েছে। বর্তমান থানা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত।

পরিশিষ্ট-৪

গণশিক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত মূল্যায়নের ফলাফল বিবরণী (১৯৯৬)
থানা ঃ লালমনিরহাট সদর

ইউনিয়নের নাম	ফলাফল (শিক্ষার্থীর সংখ্যা)							কেন্দ্র গ্রেড (পাশের হার অনুযায়ী)				
	গ্রেড-১ (৯০-১০০ নম্বর)	গ্রেড-২ (৮০-৮৯ নম্বর)	গ্রেড-৩ (৬০-৬৯ নম্বর)	অকৃতকার্য ৬০ নম্বরের নীচে	শুধুমাত্র সহি জানেন	সম্পূর্ণ খাতা অন্যের লেখা	অনু	৯৫-১০০% কেন্দ্র নং	৯০-৯৪ % কেন্দ্র নং	৮০-৯০ % কেন্দ্র নং	অকৃত কার্য ৮০% নীচে	পাশের হার
পঞ্চগ্রাম	১৩৩১	১৫৪৬	১৯৬১	১৮৭	৬২	১৯৩	৪৩	৮১	৪৭	৪৩	৩৩	৯০%
খুনিয়াগাছা	১৯৪	১৭৬৯	২৭৭৫	৪২৫	৬৭	২৭৩	১০	৬৬	২৫	১০৯	০৬	৮৮.৭৩%
বড়বাড়িয়া	১১৯২	১২৮৯	১১২৯	১২৩	১২	২৭৩	১৭	৩৯	১৫	৭৯	০৫	৮৭%
হারাটি	১৩৪৩	১৩৩২	২১৩৪	১৭৪	৮৭	১৭৮	-	৯৭	৩৫	৪৫	০২	৯২.২৯%
কুলাঘাটি	৭৫৯	১৫৭৬	৩২৩৯	৭৬৭	১১২	৯৮	-	৭৮	৩৮	৮৯	০১	৮৫%
মোগলহাট	১২৩৮	১৩৩৫	২১৫০	২৮০	৩২৯	৯২১	-	২৬	১৩	১৩৭	৫৩	৭৫.১৩%
মহেন্দ্রনগর	১৪৮৫	১৬৬১	১৮৭৩	১৩৩	১১২	৫৯১	-	৮৩	৪৫	৬৯	২৩	৯০%
রাজপুর	৩৪৪	৭৬৭	১৯৩৮	১৬৬	১৬৬	৫৫	-	২৪	১৯	৭৩	-	৮৮%
গোকুণ্ডা	১৪৯৫	২৫৪৯	৪৪৩১	৪৪২	১০২	৪২১	৭	৭১	৫৩	১৫৪	-	৮৮%
মোট	১০২১১	১৩৬২৪	১২৬৯০	২৭৬৭	১১৯৪	৩০০৩	৩৭	৫৬২	২৯৩	৭৬৮	৯৩	৮৭%

মোট কেন্দ্র সংখ্যা ১৭২৩, মোট পাশের হার ৮৬%, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই কেন্দ্র সংখ্যা ৭, মোট শিক্ষার্থী ৫১৭৬৬ জন মোট শিক্ষিত ৪৮৪৮৬ জন, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই শিক্ষার্থী ২১০ জন। কেন্দ্র সমূহ পরে শুরু হয়েছে। বর্তমান থানা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত মূল্যায়নের ফলাফল বিবরণি (১৯৯৬)
থানা : কালিগঞ্জ

ইউনিয়নের নাম	ফলাফল (শিক্ষার্থীর সংখ্যা)							কেন্দ্র গ্রেড (পাশের হার অনুযায়ী)				
	গ্রেড-১ (৯০-১০০ নম্বর)	গ্রেড-২ (৮০-৮৯ নম্বর)	গ্রেড-৩ (৬০-৬৯ নম্বর)	অকৃতকার্য ৬০ নম্বরের নীচে	শুধুমাত্র সহি জানেন	সম্পূর্ন খাতা অন্যের লেখা	অনুঃ	৯৫-১০০% কেন্দ্র নং	৯০-৯৪ % কেন্দ্র নং	৮০-৯০ % কেন্দ্র নং	অকৃত কার্য ৮০% নীচে	পাশের হার
গোড়ল	১৯২৫	৮৩১	৪২৮	২৫	২৩	৯০১	৫২	৭৭	-	২৩	-	৯৫.৩৭%
ভোটমাড়ী	১৩৩৬	৯১৭	৮৯৪	১০৯	২৩	২২৩	৪০	৪৩	২৪	৪৪	৩	৮৯.৭৮%
দলগ্রাম	৪৩৮	৯১৮	২০৪৪	২১৩	৩৪	২৫৩	৫৪	৫০	১০	৬৬	৩	৮৮.৬৫%
চন্দ্রপুর	৬২১	৯০৭	২১১৩	১৮৫	০৯	১৭৭	৩৮	৭৩	৩৬	৪৪	১০	৯০.৮৩%
চলবলা	১৭৯১	৭৪০	১০২৩	১০০	৯৯	৪৭৪	৫০	৮০	৩৮	২৯	২৪	৮৪.০৮%
কাকিনা	১৬৮৪	১৫৩৭	১৪১৪	৯৩৫	৩৫	৮২	৫১	১১৪	১৭	৩৩	০১	৯৪.৮৪%
নদাতী	১৭২৮	২২৩৭	২১৭৭	১২৯	৪৯	২৯০	৩০	১১০	৪১	৭২	০১	৯২.৩৮%
তুষভান্ডার	১১৮৩	১৯৩০	৩২৫৫	৩৮৪	১৫৭	১২৯৭	২৯	৯১	২২	১১৬	৪৪	৭৭.০৬%
মোট	১০৭৩০	৯৯৮৭	১৩৬৪৮	১৩৫৭	৩৯৬	২৯১০	৩৫২	৬৪৬	১৩৩	৪২৭	৮৬	৮৬.৫৯%

মোট কেন্দ্র সংখ্যা ১২৯৮ । মোট পাশের হার ৮৬.৫৯% । পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই এমন কেন্দ্র সংখ্যা ৬ ।মোট শিক্ষার্থী ৪৩৩১০ জন । মোট শিক্ষিত ৩৪৩৬৫ জন । শিক্ষার্থী ৭৫০ জন । অনুপস্থিত ৩৫২ জন । কেন্দ্র সমূহ পরে শুরু হয়েছে । বর্তমান থানা পরিষদ কর্তৃক ২৫ টি কেন্দ্র পরিচালিত । এছাড়া এনজিও কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্র সংখ্যা ৬।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত মুল্যায়নের ফলাফল বিবরণি (১৯৯৬)
থানা ঃ হাতিবান্ধা

ইউনিয়নের নাম	ফলাফল (শিক্ষার্থীর সংখ্যা)							কেন্দ্র গ্রেড (পাশের হার অনুযায়ী)				
	গ্রেড-১ (৯০-১০০ নম্বর)	গ্রেড-২ (৮০-৮৯ নম্বর)	গ্রেড-৩ (৬০-৬৯ নম্বর)	অকৃতকার্য ৬০ নম্বরের নীচে	শুধুমাত্র সহি দেয়াতেন	সম্পূর্ণ খাতা আনো র লেখা	অনুপ	৯৫-১০০ % কেন্দ্র নং	৯০-৯৪ % কেন্দ্র নং	৮০-৯০ % কেন্দ্র নং	অকৃতকার্য ৮০% নীচে	পাশের হার
বড়খাতা	২৫৪৯	২৪৩২	৩৯০৪	৫১২	১৩৩	৮৪৬	৩০০	৫৮	৩৪	২৪৮	০৫	৮৫%
আউরাবাড়ী	১৩২১	১৪৯৩	১৩৩৭	১০১	৮৪	১৩৩	২২৩	৯৪	৩৩	৪৩	-	৯২.৯৬%
ভেড়াবাড়ি	১১৪২	১৪৮৩	২১৩৯	১৯৫	১৩৯	৩৩৪	১৯৮	৩২	৪৩	৬৭	০৮	৮৬.১৪%
সিঙ্গীমারী	১০৮৩	১১৪৭	১৫৫৬	২২১	১০৩	২৮৭	২২৫	২৩	৩৬	৭৫	১১	৮৩.০৪%
গোতামারী	৯১৫	১৮৬৭	১০৩৭	৮৪	৪৭	১৬৬	২২৮	৮৮	০৬	২৯	০৫	৯২.০৯%
নওদাবাস	৫৭৯	১৫৩৩	১৬১৮	১৫৪	২৭	১৫৭	২২১	৬৩	২৬	৪৮	-	৮৯.০৪%
গড্ডিমারী	৯৫৮	৭৩৯	১৬৪০	৫৬	১০৮	৯৫	২৮৩	৬৮	১৪	৩৭	-	৯০.৭০%
টংভাংগা	১৯৩৩	১৩৮০	১১৩৪	৯০	৭৯	৪৪৫	২৩৮	৩৩	৫৩	৭৩	৩৫	৮৭.১৯%
সিন্দুনা	১১৩	৩৩৫	২৫৯	৩৮	২৮	২৭	১৩৮	৩২	১৫	১৩	-	৯৪.৫৩%
পাটিকাপাড়া	৫৫৮	৪৩৮	১৪৭৬	৯৫০	১৯	১৮	২৩১	৫৭	৩৮	১৯	০৪	৯৩.৫৭%
মোট	১১১৮৫	১২৮৩৪	১৬৮৩০	১৬৬৬	৭৪৭	২৫৭৯	২২৭৯	-	২৬৮	৬০৯	৩৮	৮৮%

মোট কেন্দ্র সংখ্যা ১৫৩৭ । মোট পাশের হার ৮৮% । পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই এমন কেন্দ্র সংখ্যা ১ । মোট শিক্ষার্থী ৪৮১৫০৫ জন । পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই শিক্ষার্থী ৩০ জন । কেন্দ্র সমূহ পরে শুরু হয়েছে চূড়ান্ত মুল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে নাই _ কেন্দ্র । বর্তমান থানা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত মুল্যায়নের ফলাফল বিবরণি (১৯৯৬)
থানা ঃ পাটগ্রাম

ইউনিয়নের নাম	ফলাফল (শিক্ষার্থীর সংখ্যা)							কেন্দ্র গ্রেড (পাশের হার অনুযায়ী)				
	গ্রেড-১ (৯০-১০০ নম্বর)	গ্রেড-২ (৮০-৮৯ নম্বর)	গ্রেড-৩ (৬০-৬৯ নম্বর)	অকৃতকার্য ৬০ নম্বরের নীচে	শুধুমাত্র সই জানেন	সম্পূর্ন খাতা অন্যের লেখা	অনুঃ	৯৫-১০০ % কেন্দ্র	৯০-৯৪ % কেন্দ্র	৮০-৯০ % কেন্দ্র	অকৃতকার্য ৮০% নীচে	পাশের হার
শ্রীরামপুর	১২৩৯	২১৬৫	৫০০১	২৭১	২৪৭	৬৪৮	৪১৫	৪৪	৪১	২৩৫	৩১	৮৭%
জগৎবেড়	৫৯১	১১২৫	৩১৫৫	৩৪৪	৭৩	২৪৪	৩১২	৩৬	-	৩৭	১০৪	৯১.২২%
জোংড়া	৬৯৯	১১৯৩	১৯৬৩	১৭৮	১০৮	১০৮	৩২১	৪৮	-	৩৩	৫১	৮৯.৮৮%
বাউরা	৫৯০	১১৪৯	২১৬৬	১৭৯	৩১৮	৭৯১	২৮৭	৩৭	১৭	৭৩	৩৮	৭৫.১৯%
দহগ্রাম	৪১	২৯৫	৭৬৮	৫২	৩৩	-	১০৯	১৮	-	১১	৮	৯২.২৭%
পাটগ্রাম	১৮৫৮	২৫৮২	৩১৯৩	৪৩২	২২৪	২৪৫	৪৩৯	৯৫	৫২	১২৫	০১	৮৯.৪৪%
কুচলীবাড়ী	৫৩৭	৯০০	১২৪	২৪০	১৮০	২৬১	৪১২	৪০	১৭	২৭	২৫	৭৯.৫৮%
মোট	৫৫২৪	৯৪০৯	১৬২৮০	১৬৯৩	১২২৩	২২৯৭	২৪৫৫	৩১৮	১২৭	৫৩৮	২২৮	৮৬%

মোট কেন্দ্র সংখ্যা ১২১৪ । মোট পাশের হার ৮৬% পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই এমন কেন্দ্র সংখ্যা ৩ । মোট শিক্ষার্থী ৩৯০৮৪ জন । পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই শিক্ষার্থী ১০০ জন । মোট শিক্ষিত ৩৪১৩২ জন । কেন্দ্র সমূহ পরে শুরু হয়েছে চূড়ান্ত মুল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে নাই ... কেন্দ্র । বর্তমান থানা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ।